createspace™ an Amazon.com company

Digital Proofer

Kankhe Gagori

Authored by Mrs Gargi Bhattach...

5.0" x 8.0" (12.70 x 20.32 cm)
Black & White on White paper
340 pages

ISBN-13: 9781543062670
ISBN-10: 1543062679

Please carefully review your Digital Proof download for formatting, grammar, and design issues that may need to be corrected.

We recommend that you review your book three times, with each time focusing on a different aspect.

1. Check the format, including headers, footers, page numbers, spacing, table of contents, and index.
2. Review any images or graphics and captions if applicable.
3. Read the book for grammatical errors and typos.

Once you are satisfied with your review, you can approve your proof and move forward to the next step in the publishing process.

To print this proof we recommend that you scale the PDF to fit the size of your printer paper.

কাঁখে গাগরী

সাতটি নভেলা

গার্গী ভট্টাচার্য

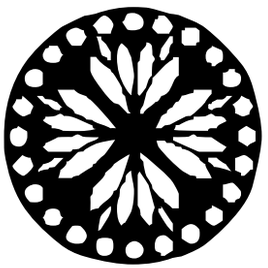

Copyright © 2017 Gargi Bhattacharya

All rights reserved.

Contact Details --- TeaTree25@outlook.com

This book is entirely a work of fiction. The names, characters, organizations and incidents portrayed in it are the work of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, events or localities, is entirely coincidental.

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

The views expressed in this book are entirely those of the author. The printer/publisher, and distributors of this book are not in any way responsible for the views expressed by the author in this book. All disputes are subject to

arbitration; legal actions if any are subject to the jurisdictions of courts of Canberra, Australia.

First Published: February 2017

Cover Design: Gargi Bhattacharya

Images :: **pixabay.com** under CCO creative commons license.

Distributed by Amazon Worldwide Distribution

Gargi's youtube channel : shalpial network

Few videos are there ; more would be uploaded later .

Current videos ::

1. Marwa
2. Neel Bharani
3. Fagun Kuasha
4. Maya Horin
5. Pushpito Jonaki

Her writing has been used as an example in the creative writing classes of a Calcutta based school...Noted Indian mainstream publisher Dey's Publishing has marketed many of her books.

All of her books published by Power Publishers (12 books) will always be available on http://www.purushottam-bookstore.com/ and

http://www.power-publishers.com/

Books by the author : (Years active 2006-16) **BOLD=BEST SELLER**

1. **Chander mohuabone (as Chander coffee shope)**
2. **Maya horin**
3. **Fagun kuasha (as Hemanter bishh)**
4. **Mayurkonthi bolkol**
5. **Neel bharani**
6. **Pishach**
7. **Machhranga**
8. **Mrigashira(as Digital Polash)**
9. **Andolika**
10. **Tofu tring**
11. **The clay egg (as The egg & Kindle version of The Clay egg)**
12. **Pushpito jonaki**
13. **Ghumpahari aator**
14. **Tuhinrekha**
15. **Kamakshi**
16. **Ava Cho**
17. **Chameli phool**
18. **Fungus**

19. **Hemate**
20. **Gothic Church**
21. Mom rong
22. Mehgony homshikha
23. Megh jochhona
24. Bhooter boi doll putul
25. Pekhom buro
26. Domru
27. Cordless Hathpakha
28. Kankhe Gagori

----(a collection of previouly published novellas)

Dedicated to my parents ::

Maa, Bapi, Shashuri Maa and

Shashurmoshai (Mom and Paa in laws)

Seven Novellas ::

1. Ava Cho
2. Hemate
3. Pishach
4. Machhranga
5. Gothic Church
6. Chameli Phool
7. Fungus

আভা চো

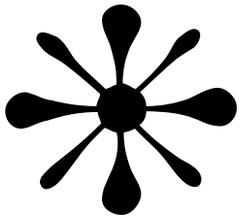

আভা চো

আভা চো এক চৈনিক মহিলার নাম । আসল নাম হয়ত কিছু একটা ছিলো কিন্তু বিদেশে এসে সেই নাম বদলে ফেলেছে । এখন এখানে লোকে ওকে মেমসাহেব নামে ডাকে -- আভা !

আদতে ও চৈনিক কিনা তাও কেউ জানেনা ।

যার মুখে এই গল্প শুনেছি সে বলেছে যে ওকে দেখতে চীনাদের মতন কিন্তু ও আসলে কোন দেশ থেকে এসেছে সেটা কেউ জানেনা কারণ কেউ ওকে জিজ্ঞেস করেনি । হয়ত প্রয়োজন হয়নি ।

এখানে এসে ও এক Half সাহেবের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয় । সাহেব একজন বাজিয়ে । মিউজিশিয়ান যাকে বলে ।

আভা একটা অদ্ভুত যন্ত্র বাজাতো ;প্লাঁম্ ।

সেই বাদ্যযন্ত্রই এই কপোত-কপোতীকে এক নীড়ে বেঁধেছে ।

এই আভা -চো,আগে যেই দেশে থাকতো সেখানে সে চুরুট তৈরি করতো । ওখানে মেয়েরাও সবাই ধূমপান করে । কেউ কিছু মনে করেনা । ওটা ওদের কালচারে আছে । একটি চুরুট কারখানায় সে কাজ করতো । সেখানে মেয়েরা সবাই- ঘন্টায় অজস্র চুরুট বানায় ।

সেটা রেকর্ড বলেই মানা হয় । এক একটি চুরুট ইয়া বড় সাইজের , এক ফুট । ওপরটা দেখে টুপি বলে মনে হতে পারে । ওরা বলে :: শুরাট । ওর মা প্রথম ওখানে কাজ নেয় । ওদের পরিবারে । মাও চুরুট পান করতো ।

আভারা সাত ভাইবোন মায়ের সাথেই ছিলো । কিন্তু দেশে মিলিটারি শাসন হল আর শুরু হল গণ ধর্ষণ , হত্যা ও নানান ব্যাভিচার । হয়ত সেই কারণেই ওদের মা নিজ হাতে সাত-সাতটি সন্তানকে ভিনদেশের জাহাজে তুলে দেয় । ক্রীতদাস হিসেবে । খেয়ে পরে বাঁচুক অন্তত: ।

পেটভাতায় খেয়ে , গতর খাটিয়ে বেঁচে থাকবে । দেশে থাকলে মৃত্যু হবেই । কখনও না কখনও ।

আভা বিদেশে এসে -প্লাঁম্ বাজিয়ে সময় কাটাতো । চুরুটের মতন যন্ত্র, তাতে তার বসানো গীটারের মতন । সেই তার নাড়িয়ে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সৃষ্টি হয় ।অন্যদিকে ফুঁ দেয় । আর এই বাদ্যযন্ত্র বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় । সুমিষ্ট শব্দ ।

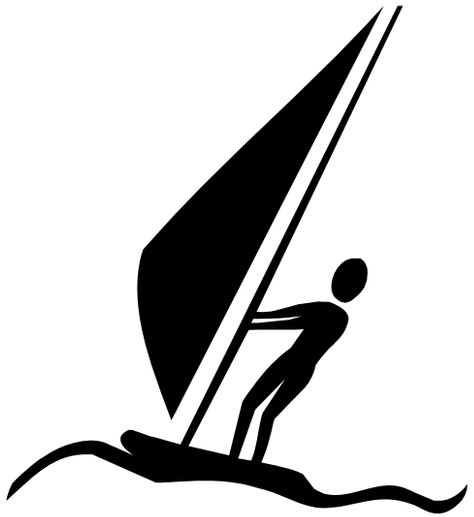

এই কাহিনী সবাইকে বলে **একটি গুলমোহর গাছ,** যার কোটরে পরেরদিকে আভা বাস করতো । গাছটি আগে ছিলো এক আজব দেশে । সেই দেশ, ওদের ধর্ম দ্বারা চালিত । বর্বর জাতীয় এই ডিসটর্টেড ধর্মের নাম **ফোফো চুঘতাই** ।

অসামান্যা রূপবতী **গুলমোহর গাছ** । আর সে ফোফো-চুঘতাইয়া হলেও কিন্তু ফ্রি-থিঙ্কিং করতে অভ্যস্থ । কাজেই ছিলো এক মুক্ত মনের মানবী । ওর স্বামী ওকে সোসাল কজের জন্য ত্যাগ করেন । ভদ্রলোক আসলে বিজ্ঞানী ছিলেন । ঐদেশে বিজ্ঞানের ওপরেও রিলিজিয়াস্ চাপ থাকে ।

প্রিস্ট যা চাইবে তাই হবে । যদি জলের সমীকরণ বলতে হয় **এন টু পি এইচ ৪ : N2PH4;**

তাহলে সেটাই বলতে হবে বিজ্ঞানকে অজ্ঞান করে ।

গুলমোহর গাছ তার স্বামীকে বলে বিদেশে পাড়ি দিতে । কিন্তু স্বামীজী ফতে আলি বলেন :: সবাই দেশ থেকে চলে গেলে , এত ব্রেন ড্রেন হলে দেশের কী হবে ?

সত্যি- অনেক স্কলারই তো চলে গেছেন । আমেরিকা , ব্রিটেন , ফ্রান্স এইসব দেশে । সেখানে বিজ্ঞানের নিয়ম একই । সমাজের নিয়ম অন্য । তাই ।

কিন্তু গুলমোহর গাছ যার আগে নাম ছিলো **-গুলনার,** সেই অসামান্যা মেয়েটির পতিদেব দেশ ছেড়ে যাবেন না । কাজেই ওকে একাই চলে আসতে হয় । ও একটু মুক্তমনা বলে নিয়মিত পার্টি , খোলামেলা পোশাক , মদ্যপান , ধূমপান ও নাচ করতে ভালোবাসে । কিন্তু ঐ সমাজে এগুলি অস্বীকৃত ও উচ্ছৃংখলতা বলে মনে করা হয় । ওরা মেয়েদের ; ব্যান্ডেজ ভূতের মতন আপাদ মস্তক কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে । কিন্তু তারা সবাই এত রূপবতী ! সেই রূপ না দেখালে আর লাভ কী ?

তাই গুলনার চলে আসে প্রবাসে । মুক্ত সমাজে । যেখানে এইসব জিনিসের কদর করা হয় । সবাই সম্মান পায় এখানে এবং মানুষ-- সততা , সভ্যতা আর কর্মসংস্কৃতির ওপরে জোর দিয়ে থাকে ; নানান ট্যাবু না মেনে । কাজেই এখানে এসে সে খুব ভালো আছে । তার এই জীবনে আর কিছুই চাইবার নেই বলে এখন এক মহীরুহ হয়ে সবাইকে ছায়া প্রদান করে । এক প্রকার দেহত্যাগ করেছে আর কি !

শুরুটা হয়েছিলো রেড ক্রসে কাজ দিয়ে । সেবা দিয়ে । সেই সেবিকা থেকে এখন ও একটি গাছ । এমন গাছ যা কেবল মানুষ ও পশুপাখির শীতল ছায়া নয় ; এই গাছ গল্প বলে । প্রতিটি পাতা ও ডাল তার কথা ফোটায় । জীবন্ত তাদের নীরবতা । অঙ্কুরিত হয় শিলালিপি ।

এইদেশে যারা ক্রিমিন্যাল , জেল খাটে অথবা দেহ ব্যবসা ইত্যাদি করে তারা যেকোনো সময় চ্যারিটিতে যোগ দিতে পারে । কেউ প্রশ্ন করেনা ওদের ।

আস্তে আস্তে তারা নিজেদের দক্ষতা ও সততা দেখিয়ে মেনস্ট্রিমে ঢুকে পড়ে । তবে এখানকার শাস্তি ব্যবস্থা একটু ভিন্ন । লোহার গরাদের আড়ালে থাকলেও যার যেটা ইন্‌সিকিউরিটি সেটা তাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় । যেমন যে পোকা ভয় পায় তাকে পোকার মধ্যে ফেলা, যে অন্ধকার ভয় পায় তাকে আলোহীন সুড়ঙ্গে রাখা এইরকম ।

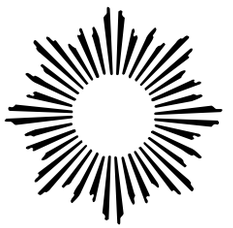

গুলনারের স্বামী ফতে আলি বেশ ব্রিলিয়্যান্ট বিজ্ঞানী । কিন্তু হলে কী হয় ? ঐদেশে ধর্ম সব কন্ট্রোল করে ।

ধর্মযাজক না চাইলে বিজ্ঞানের সত্যগুলি লোক সমাজে প্রচার করা হয়না । কাজেই পৃথিবীর বুক থেকে জল কমে যাচ্ছে এই তথ্য ঐদেশে অনেকেই জানে না ।

ফতে আলিসাহেব যে সেই কারণে আলোক রশ্মি দিয়ে স্নানের আয়োজন করেছেন এবং তার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র নির্মাণ করেছেন তা চাপা পড়ে গেছে ধর্মের কারণে । এই আলোক ছটা, ঐ যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে বসলেই নিজে থেকে বিচ্ছুরিত হবে । আর দেহ সাফ হয়ে যাবে কোনো জল ছাড়াই । এতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়না । আলোর রং আছে । গাঢ় লাল । অনেকটা রক্তের মতন । যন্ত্রটি- অনেকটা আধুনিক বিমান বন্দরের টয়লেটের মতন, ছোট খোপ কাটা ।

দেহ ; ক্লিন করে লিম্ফ গ্ল্যান্ড । প্রাকৃতিক উপায়ে । তাই লিম্ফ-গ্ল্যান্ডের অনুকরণে নাম দিয়েছিলেন ::: লিম্ফিস্তিমা । কিন্তু ধর্মের কারণে ঐ যন্ত্র, মানব সমাজের সম্মুখে আনা হয়নি । ওরা মনে করে জল পবিত্র । অন্য কিছু দিয়ে দেহ সাফ হবেই না !

ফতে আলিসাহেব এখানেই থেমে থাকেন নি । উনি ব্রেনের নতুন কিছু এরিয়া লোকেট করেছেন যেখান থেকে মানুষের মাথায় এইসব কুসংস্কারের ভূত চেপে বসে । ঐসব এরিয়ার কথা আগে বিজ্ঞানীরা জানতেন না । একটি বিশেষ হরমোন যার নাম উনি দিয়েছেন **কার্স** , সেই হরমোনের কারণে ঐ অংশ অ্যাক্টিভেট হয় এবং মানুষ, পশুর মতন যুক্তিহীন আচরণে আবদ্ধ হয় । ধর্মে কেন এটা করতে বলা আছে সেটা লজিক দিয়ে না ভেবে অন্ধ অনুকরণ করতে শুরু করে ।

অর্থাৎ এটা একপ্রকার অসুখই । ফতে সাহেব মনে করেন যে জগতে নাস্তিকেরা আছেন বলেই সমাজে শ্বাস নেওয়া যায় । নাহলে এই ভন্ডের দল, নানান যুক্তিহীন অনুশাসনে বেঁধে মানুষকে কচুকাটা করতো ।

সুতরাং বোঝাই যায় যে তার আবিস্কৃত এইসব বস্তু লোকসমাজে চর্চিত হবেনা কখনই । তবুও দেশের ও দশের কথা ভেবে উনি ঐ দেশেই রয়ে গেছেন ।

গুলনার এখানে এসে মুক্ত-মেয়ে হয়েই আছে ।

প্রথমে অপরূপ শরীর দেখাতো । স্ট্রিপিং করতো । নিজ নগ্নদেহ, বিকাতো লোকসমাজে । এক এক করে নিজ বস্ত্র খুলে নিজেকে মেলে ধরতো পুরুষদের

সামনে । ইদানিং লেসবিয়ান মানুষও আসা শুরু করে । কাজেই ক্লায়েন্ট বেড়েছে । কিন্তু সেইরকম এক মহিলা ক্লায়েন্ট- যে একটি ব্যাঙ্কে লোন অফিসার ছিলো তারই উৎপাতে কাজ ছাড়তে হয় । মেয়েটি সমকামী কেউ জানতো না । আর তাই ওকে মলেস্ট করলে কেউ বিশ্বাসও করতো না । ওর ন্যাংটো শরীরটা নিয়ে যাচ্ছেতাই করতো , ওর পিছুধাওয়া করে টয়লেটেও চলে যেতো । গোল গোল চোখ করে বলতো :: তোমাকে আমি চুষবো , চাটবো ।

শেষে ও কাজ ছেড়ে দেয় । অনেক বছর তো এসব করলো । এখন প্রায় চল্লিশের কাছে । যৌবন ঢলে যেতে যেতে ও নিজেও চলে যেতে চায় ।

হরমোন ইঞ্জেকশান নিয়ে বস্ত্রহরণের খেলায় মাততে চায়না । হয়ত তাই রেড ক্রসে, সমাজ সেবার কাজ নেয় । আর এখন বৃক্ষ হয়ে সবাইকে শীতল ছায়া দেয় । মেটামরফসিস্ । মেটাফোর্ । মেসমারাইজিং ।

ফসিল ফসিল ফসিল । ওর চেতনা ফসিল হয়ে গেছে ।

সে নিজেই আভা চো-র গল্প বলে সবাইকে । আভা চো নাকি আগে খুব মাংসাশী ছিলো । পর্ক ও ডিম খেতো । হুইস্কি পান করতো ; তারও আগে ভাত পচানো দেশী মদ । আর খুব স্মোক করতো । এখন বদলে গেছে ।

আভা চো-র স্বামীর এটা তৃতীয় বিয়ে । প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করে যখন ওরা দুজনেই মাত্র ১৫ । ম্যাকডোনাল্ডের টয়লেটে সেক্স করতো । বাড়িতে কেউ ওদের স্বীকার করেনি । তাই । স্ত্রীর ভীষণ মুখ খারাপ ছিলো । প্রোফ্যানিটিতে ডক্টরেট । ১৮ বছর বয়স হলে দুজনে একসাথে থাকা শুরু করে । দুই মেয়ে হয় ।

বৌটি কাজ নেয় রিয়ল এস্টেট এজেন্ট হিসেবে । আর আভা চো এর স্বামী, টক্সিক কেমিক্যালের কারখানাতে কাজ নেয় । এইসব এরিয়াতে বেশি লোক যেতো না তখন, প্রাণ ভয়ে । কাজেই কমোডিটি ট্রেডার হতে সময় লাগেনি তার । সমাজে আমরা যাকে বিষ মনে করি , মগনলাল মেঘরাজের মতে :: বিস্ খুব খারাফ জিনিস্ আছে !

সেই বিষই এদের কাছে অমৃত । বিষ যেন খুব তাড়াতাড়ি- ওদের ধনসম্পদ ঢেলে দিয়েছে । আজকাল কোথায় না বিষ লাগে ? মারণাস্ত্র থেকে শুরু করে গৃহস্থের রোজনামচা--সর্বত্র । তাই সমুদ্র মন্থন করেই সেই বিষ ধারণ করেছে নিজ কন্ঠে, আমাদের ক্ষ্যাপা দেবতা , শিবশম্ভু নন স্বয়ং আভা চোয়ের স্বামী :: **দাফা তেগু চো ।**

প্রথম স্ত্রীকে ভালোবাসলেও সে ওকে ছেড়ে অন্য পুরুষে যায় । এক ফ্রেঞ্চম্যান । আদ্রিয়ান । পেশায় নাবিক । নানান দেশে ভেসে বেড়াতো । বন্দরে বন্দরে বৌ কিনা **দাফা তেগু চো** জানেনা । তবে নিজ বৌ খোয়া গেলো, আদ্রিয়ানের কল্যাণে । দুই মেয়ে নিয়ে এক ধূসর গোধূলিতে, হাওয়া হয়ে যায় ওর বৌ । এখন সবাই তাকে পত্রিকায় দেখে । ম্যারেজ কাউন্সিলার হিসেবে খুব নাম করেছে কিনা ! রিয়ল এস্টেটে আর নেই । তবে ওকে দেখানোর জন্যেই বোধহয় আমাদের দাফা তেগু চো এক বিশাল টাওয়ার নির্মাণ করে । **চো টাওয়ার** । যেখানে সে বেঁচে থাকাকালীন আভা থাকতো । এখন বেরিয়ে এসেছে বাণপ্রস্থে ।

প্রথম বৌয়ের দুই সন্তানকে পেলেছে **দাফা তেগু** নিজেই । বৌয়ের কাছে ছিলো ওরা কিন্তু চো নিয়মিত টাকা দিতো আর দেখাও হত । কারণ ওরা ওর নিজের মেয়ে

আর আদ্রিয়ান, পরে কোনো কাজ করতো না । নিজ দেশে থাকতে, সে নাকি খুব কর্মঠ ছিলো । তাই নাবিক হয় । অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিলো । পরে বিদেশের কোনো দেশে ; সম্ভবতঃ ভারতে , সে থর মরুপ্রান্তে মানুষকে জল সরবারহ করতো । গিয়েছিলো ওখানে কাজ নিয়েই । কিছু গ্রামের মানুষ নানান শস্য যেমন বাজ্‌রা, সর্ষে , মূলো ইত্যাদি চাষ করতো শুষ্ক মরুতে । সেই শস্য বাজারে বিক্রি করে দিন কাটাতো । তাদেরই ছেলেপুলেদের লেখাপড়া করানোর জন্য সরকার অনেক স্কুল খোলে । মজার ব্যাপার হল এখানে মাইনে নেই । থাকা ও খাওয়া-পরা ফ্রি ।

বদলে সরকার উটের ভরণ পোষণ করতে বলতো । সপ্তাহে তিনদিন স্কুল খোলা থাকে । বাকি সময় উটপালন ।

হাতে মাইনে না পেলেও এখানে মাসে একবার করে বিরাট লটারি হত । সেখানে প্রায় সবাই কম করে ১০০০ টাকা পেয়ে যেতো । টিকিট কাটলেই ১০০০ টাকা । তাই হয়ত আদ্রিয়ান ওখানে জল ফেরি করতো । ওর জল থাকতো মহাসাগরে । সেই অলীক জল, বালি মাখা হলেও অসম্ভব মিষ্টি ও শীতল ।

ধূসর, রুক্ষ্ম মরুতে এই জলের উৎস হল নাবিক আদ্রিয়ানের **মন সমুদ্র** । সমুদ্রে অঢেল জল । কোনো

শেষ নেই । লহরী কেবল নোনা । নুন তরঙ্গ । তাই হয়ত বা এতগুলি সমুদ্র ও মহাসমুদ্র থাকতেও আজ দুনিয়ায় জলের আকাল । নিজের মুত্র নিজেকেই পান করতে হচ্ছে স্রেফ জলের অভাবে । পরিবারের সবাই মুত্র ত্যাগ করে জলের পাত্রে । কলসে, জগে, ওয়াটার বটলে । সেই প্রস্রাব পান করে নির্দ্বিধায় , সবাই । কারণ উপায় নেই । শাস্ত্রে যখন বলা হয়:: **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট** ; তখন পন্ডিতেরা বাঁকা হাসি দেন। বলেন :: ওসব ওল্ড আইডিয়া ।

এখন বাথরুম উঠে গেছে । প্রতিটি মুত্রকণা এখন মূল্যবান । সবাই :: বাঞ্ছারামের মতন :: **এই নাও শিশি, এতে ধরে রাখো হিসি** ফিলোসফি মানতে বাধ্য হচ্ছে ।

তাই -সামুদ্রিক নুন ছেঁকে নিতো আদ্রিয়ান তার মন কলসে । তারপর জল সরবারহ করতো দগ্ধ প্রান্তরে । নির্মল জল । আজকাল বিজ্ঞাপনের যুগ ।

লেখা হত :: জলের স্বাদ ফিরে এলো ।

কিংবা : ড্রিংকিং ওয়াটার -ফ্রম টয়লেট টু সি বিচ্

মাঝে তো বাথরুম অনেকটাই মন্দিরে পরিণত হয়েছিলো !

পরে সেই মানবদরদীই এসে, দাফা তেগু চোয়ের প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে চম্পট দেয় । শেষে দাফা তেগু, এক অন্য নারীতে যায় । তাকে বিয়েও করে । নাম তার ইলিয়া । ইলিয়া, দাফার চেয়ে অনেক ছোট । কুতকুতে চোখ । উন্নত নাসিকা । সোনালী চুল । কেমন যেন আল্‌নার মতন দৈহিক গড়ণ তার !

অনেকগুলি সন্তান হল তো ওর । কিন্তু বেশিরভাগই মারা গেলো । লোকে বলে, ওদের বাবাই ওদের হত্যা করেছে । মায়ের গর্ভে । বাচ্চা হবে শুনলেই ওকে অ্যাবর্ট করাতো দাফা তেগু । পরে অবশ্য তিন সন্তানকে গ্রহণ করেছে লোকটি । আগেরগুলি সবই মায়ের পেটেই মারা গেছে ।

আজকালকার বাচ্চা তো ! জন্মের আগেই বাবার সব ব্যাভিচারের কথা, টুইট্ করে গেছে ।

ইন্সটাগ্রামে ফটো দিয়ে গেছে কীভাবে ওদের অ্যাবর্ট করছে দাফা তেগু । সারা দুনিয়া দেখছে !

এতগুলি সন্তানকে নৃশংসভাবে গর্ভে, হত্যা করেছে বলেই কিনা কেউ জানেনা দাফা তেগুর দ্বিতীয় বৌ পালিয়ে যায় । তারপর আভাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে, বাজনার জন্য । ওর সৎ সন্তানেরা, ওকে মা হিসেবে গ্রহণ করে । শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো । বলতো :: সি ইজ অ্যান অ্যামেজিং মাদার !

কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরে, **চো টাওয়ার** ছেড়ে আভা বেরিয়ে আসে । কোনো ঝামেলা না করেই । বলতো :: আমার সাংসারিক জীবন শেষ হয়ে গেছে ।

বাইরে এসে, ঐ গুলমোহর গাছের কোটরে থাকতো । আগে অরণ্য থেকে কাঠ যোগাড় করতো । কাঠগুলো লোকে সস্তায়- জ্বালানি, ফায়ারপ্লেসের কাঠ হিসেবে কিনে নিতো । এখন বয়স হয়েছে বলে ও মাটির জিনিস বানায় । কুমোরদের মতন । অল্প কাজ করে । ওর একার চলে যায় । নিজে মাস্টার চুরুট বাঁধিয়ে হলেও ওসব আর করেনা । স্বাস্থ্যকর নয় বলে ।

মাটির জিনিস বায়ো ডিগ্রেডেবেল । দেখতেও ভালোলাগে । মাটির সুগন্ধ লেপ্‌টে থাকে প্রতিটি কণায় ।

বুড়ো বয়সে মাটির কাজ শিখে নিয়েছে আভা চো । যে চৈনিক কিনা তাই নিয়ে লোকের মনে সংশয় আছে ।

তবু তাকে কেউ কোনোদিন প্রশ্ন করেনা !!

কারণ তাতে কিন্তু সত্যি কারো কিছুই যায় আসেনা ।

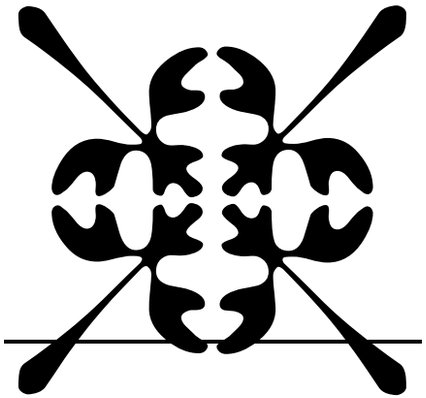

বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে বিক্রি করা আভা চো, থাকতো গুলমোহর গাছে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে। এখন মাটির রূপকার। ওর স্বামী নেই। মারা গেছে। আভা বলতো গুলমোহর গাছকে ::**আমি আর কাকে বাজনা শোনাবো ? কী করবো ঐ মহলে থেকে ? মহলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। ওখানে পুতুল আছে, মানুষ নেই। কেন মানুষ পুতুল হয়ে যায় ? কেন সমুদ্র মন্থন করে শান্তিবারি নিয়ে আসা মরুমানুষ হঠাৎ অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পলায়ন করে ? কেন নিজ বা আত্মীয় সন্তানকে এক এক করে হত্যা করে, মামা কংসের মতন কোথাও, কেউ ?**

নি:সঙ্গ সন্ধ্যায় মনে হয় একটা চোর অন্তত: আসুক। মানুষ নেই। জনমানবহীন প্রান্তরে একটি বন আর গুলমোহর গাছ। সেখানে বাস করে আভা চো নামে এক ধনী ব্যবসাদারের প্রিয় স্ত্রী , সৎ বাচ্চাদের একান্ত আপন মা । মাংসাশী আভা এখন নিরামিষ খায়। চা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি এক আচার আর মোটা রুটি। সেই রুটি আগুনে শেঁকে নেয়। বড় বড়

আটার দলা হাতে চেপ্টে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় আগুনে । পুড়ে তৈরি হয় রুটি । চা পাতার আচার আর বুনো শিম্, ঝিঙে জাতীয় সবজি, নানান বুনো শাক্ ও কচু খেয়ে দিন কাটায় আভা চো ।

নিজের পূর্বাশ্রমের কথা বড্ড মনে পড়ে । দিনান্তের ফিকে আলোয় বসে । গুলমোহর গাছ তখন কথা ঝরায় । সুরবাহারে প্রাচীন তান ।

ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স , চুরুট কারবারি মায়ের বিচ্ছেদ- তার বাবার সাথে , মায়ের নিজ হাতে সব সন্তানকে ক্রীতদাস করে বিদেশে প্রেরণ - এক এক করে মনের স্ক্রীনে ভেসে ওঠে । সত্য হজম করাই সবচেয়ে কঠিন । রিয়েলিটি সবচেয়ে শক্ত । হীরে কিংবা প্ল্যাটিনামের চেয়েও । জীবনটা কারো স্কেচ করা নয় । এক অজানা স্ক্রিপ্ট । শুধু অভিনয় করে যেতে হয় শেষ অঙ্ক অবধি । এই নিয়ম জগৎ সংসারের ।

আভা নাকি বলতো ::: **আমি তেমন কাউকে আমার জীবন নিয়ে লিখতে দেবো যে একটি সরলরেখায় আমার জীবনী লিখতে সক্ষম । পয়েন্ট টু পয়েন্ট । পোভার্টি টু পোভার্টি ।**

এগুলি আভার জীবন দর্শন । ওর মা চুরুটের মতন প্রাণনাশ করে এমন জিনিসের কারবারি । ওর বাবা ছিলো শিকারী যে অকারণে বন্যপশু শিকার করতো নিছক মজা দেখার জন্য । আগে শিকারে সাহায্য করতো । গাইড হিসেবে । রাজা গজাদের । পরে নিজে পোচিং করা শুরু করে । আর এদিকে আভার স্বামী তো তার সিংহভাগ সম্পত্তি গড়েছে বিষাক্ত বস্তু কেনাবেচা করে । কমোডিটি ট্রেডার অফ টক্সিন ।

বিষ ব্যবসায়ী । বিষ কেনাবেচা করে জীবন কাটায় । কারো কাছে যা বিষ ওর কাছে তা অমৃত । গরল নয় । অমৃত , গরল এসব তো আমাদের মনে । সাপের বিষ যাকে বলো তা তো সাপের নিজস্ব । গরল নয় । কত বিষবৃক্ষ , বিষ ছড়ায় । সেগুলি গাছের আত্মজ । আমাদের বিষ ।

কপাল কুন্ডলাও তো কারো না কারো মেয়ে ?

আচ্ছা , আভা চো সম্পর্কে পাঠকেরা কী শুনতে চায় ? কী ভাবছে ?

আমি যা ভেবেছি সেটা হল এই যে আভা কোনো সাধারণ রমণী হতেই পারেনা । স্রষ্টারা শুধু চরিত্র গাঁথেন না , চরিত্রকে পথ দেখান । আমি মাটির জিনিস বানাই না , মাটি-শিল্পী নই আমার চরিত্রের মতন । ইন্‌ফ্যাক্ট আমি মাটিতে ঘৃণায় হাতই দিইনা ! তাই আমার রক্তমাংস দিয়ে গড়া **আভা চো** হবে ঠিক এইরকম ----------!

আভা চো নিজেকে শান্তি দিতে রং জোছনায় ডুবে যায় । অর্থাৎ কালার থেরাপি করে । সুন্দর সুন্দর রং দিয়ে মাটির কলস আঁকে । তার গায়ে রঙীন , রঙ্গোলি বানায় । আর সেই রং মানুষের চেতনায় আনে ঠান্ডা ভাব । যখন কাউকে সে মাটির পাত্র বিক্রি করে তখন মোলায়েম হাতে স্পর্শ করে ক্রেতার দেহ । আর রং চং মাখা পাত্রটি হাতে নিয়েই ক্রেতা ডুবে যায় এক অমল শান্তির পারাবারের ।

মাটি যেমন পুড়ানো হয় সেরকম আভা নিজেও নিজেকে আগুনে পোড়ায় । প্রতি সপ্তাহে , একবার করে । এতে তার দেহ পোড়ে না । মনটাকে পোড়ায় ।

দেহ একইরকম থাকে । কাঠকুটো জুটিয়ে নিজেই নিজের চিতা তৈরি করে । তারপর তাতে অবগাহন করে । মন পুড়ে গেলেই উঠে আসে ; আগুন থেকে ।

চারিপাশে ভস্ম থাকে । আভা কিন্তু পোড়েনা ।

শুধু প্রতি সপ্তাহে, পাখির ডানায় উড়ে আসা সভ্যতার ভেজাল যা ওর মনে বাসা বাঁধে তাকে পুড়িয়ে ফেলে ।

খুব অদ্ভুত তাই না ? **আভার প্রথম প্রেমও আজব ।**

আকাশের চাঁদ ওর ফার্স্ট ফ্লেম । পূর্ণিমার চাঁদ ।
ওদের দেশে বলতো :: পৌর্নিম্ ।

সেই তার ফার্স্ট-ক্রাশ্ ।

সেই আভাই একদিন হঠাৎ মারা গেলো । আগুনে পোড়ে তার মন , দেহ নয় । তাই ওকে কবর দেওয়া হবে সম্ভবতঃ। আভার মৃতদেহের ওপরে ঘুরে বেড়ায় অজস্র মাছি নয় , চিন্তার রেখা । চিত্র । ওর বাবার জীবন । মায়ের কষ্ট ও ভাইবোনেদের নিজস্ব জীবন যাপন । আমি কেবল ওর বাবার জীবন-যুদ্ধটাই দেখতে পেলাম, আতসকাঁচ দিয়ে ।

আশ্চর্য চেতনার স্ফুরণ ।

আভা চোয়ের বাবার জীবন । অদ্ভুত মানুষ ছিলো সে ।

আভাদের গ্রামে সবাই পালোয়ান । পুরুষেরা । বংশ পরম্পরায় তারা পালোয়ান-গিরি করে কাটায় ।

ছোট থেকে কুস্তি করা , দেহচর্চা , লাঠি খেলা ইত্যাদিতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে । পরে বিভিন্ন শহরে ওরা বাউন্সারের কাজ করে । অর্থাৎ বডিগার্ড । নতুন প্রজন্মের সবাই, নানান প্রফেশনের হাতছানি এড়িয়ে বাউন্সার হতেই চায় । সবাই ম্যানলি, বডি বিল্ডার আর ব্যায়ামবীর কিন্তু ওরা কর্মী , অ্যামেচার নয় ।

আজকাল হৃদরোগ আর সুগারের যুগে সবাই ফিট থাকতে চায় । জিম করে নিয়ম করে, শখে নয় । কিন্তু

এই গ্রামের সবাই আখড়ায় যায় ছোট থেকেই । যখন দেহে বাসা বাঁধেনি কোনো অতিরিক্ত মেদ কিংবা চর্বি । ওরা কুস্তির সঙ্গে ভারোত্তলন আর যোগব্যায়াম করে । খায় পরিমিত মানে ওদের যা প্রয়োজন সেইরকম । সফেন চালের ভাত, থক্‌থকে ডাল, ছানা , রাজ্‌মা, কলা , খাঁটি দুধ, মাংস, ডিম, ফলমূল এইসব খায় । ওরা মদ, সিগারেট পান করেনা ও ড্রাগস্‌ নেয় না । এমনকি সাপের ছোবলও নেয় না নেশার জন্য (***snake venom)*** --একদম ফিট্‌ বডি !

ওরা পর্ণো দেখেনা, নগ্ন নারীদেহে হাত বোলায় না । মনের দিক থেকেও একদম নির্মল ! বড় বড় শিলাখন্ড, লোহার বল, বিশাল যন্ত্র তুলে দেহচর্চা করে । নিজেদের কাজ নিয়ে গর্বিত । কারণ ওদের জন্যই আধুনিক হিংসার যুগে, বড় বড় মানুষেরা সুখে থাকতে পারেন ও কাজকম্মো করতে সক্ষম ।

Old India's Village of Warriors Becomes Birthplace of Bouncers—The New York Times.

There are few places in India where historical periods slam into each other quite so forcefully as they do on the outer edges of Delhi. The musclemen from the village of Fatehpur Beri are the descendants of the original inhabitants of the city, a genetic line that fortified itself over the course of centuries as they defended their village against waves of invaders on their way to the seat of empire. The sons and grandsons of cow and goat herders, they were born in an outpost surrounded on all sides by croplands. As Fatehpur Beri was swallowed by the expanding city, its spartan strongmen continued to train in the traditional way, stripping down to loincloths and wrestling in a circle of mud. But they were forced to look for a new line of work.

> "There is an element of the warrior in the Tanwars," said Ankur Tanwar, who opened the village's first gym about a decade ago. "We fought with the Muslim invaders. We fought with the Britishers."
>
> "Much has changed in the last 20 years," he added, with a thoughtful pause. "We never thought we would be working in bars."

Continue reading the main story::

https://www.nytimes.com/2015/02/22/world/old-indias-village-of-warriors-becomes-birthplace-of-bouncers.html?_r=0

ওদের গ্রামে প্রচুর বাঁশবন । বাঁশগাছ । সেই বাঁশ ওদের কাজে লাগে । জলোচ্ছ্বাসে ভরা নদীর নামও বাঁশমণি । আরেকটি ঝিল আছে তার নাম বাঁশরি।

ওরা তুলসী গাছের মতন বাঁশগাছকে মনে করে পবিত্র । বাঁশগাছের পুজো করে । বাঁশের উপকারিতা নিয়ে এতই সরব ওরা যে বলা হয় ::যেখানে বাঁশগাছ নেই সেখানে মানুষ নেই ।

ওরা খুব বাঁশিও বাজায় । সেই সুরে পেখম মেলে নেচে ওঠে ময়ূর । রামধনু রং এর আবার সাদা ময়ূরও ।

কাজেই আভার বাবাও আগে বাউন্সার হয়েই কাজ করতেন এক বড় শহরে । সেখানে এক প্রাক্তন দেহপসারিনী, হাই প্রোফাইল ক্লায়েন্টদের সিউকিউরিটি সাপ্লাইয়ের কোম্পানি চালাতো । কাজ করতে করতেই এক যুবরাজের নজরে পড়ে আভার বাবা ঘাসিলিং ।

সেই যুবকের শখ ছিলো বেয়াড়া শিকার , ফাস্ট রেসিং কার ও জুয়া । ভদ্রলোকের বডিগার্ড হয়েই শিকারের নেশায় পায় ঘাসিলিং-কে । ছুটিছাটায় বনে যেতো ওরা । নিরীহ পশুদের হত্যা করতো নেহাতই মজা দেখার জন্য । তারপর বুনো শূকর , হরিণ ইত্যাদি পুড়িয়ে খেতো । সবাই মিলে । নিয়মিত এরকমভাবে নির্মল কতগুলো পশুকে বিনা কারণে মেরে খেলা করার জন্য আভার মা প্রথমদিকে ওর বাবার খুব সমালোচনা করতো । বারণ করতো । পাপ করতে না করতো । --অসহায় জীব, অবলা জীবদের কেন মারো তুমি ?

--ওটা আমার নেশা ও পেশা । ওরা আমার মালিককে আক্রমণ করতে পারে ।

আভার মা জানতো যে এটা অসত্য । পশু শিকার ওর বাবার পেশা নয়, নেশা হয়েই গেছে । মদের নেশার মতন । অনেকবার বারণ করেও শিকার বন্ধ করা যায়নি ।

আভার মা তো চুরুট বাঁধিয়ে ছিলো । তাই পশুহত্যা নিয়ে সরব হলেও ওর নিজের কাজও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মন্দ বলে হয়ত ভেতরে ভেতরে একটু মিইয়ে থাকতো । শেষকালে অবশ্য এই শিকারের নেশার জন্যই ওর বাবা ও মা আলাদা হয়ে যায়- ভিন্নমতের কারণে ।

--চুরুটের ধোঁয়াও মানুষ মারে । আমি পশু মারি আর তুই মানুষ মারিস্ ! বলতো আভার বাপ্ ।

--তুই খুনী ; তুই বেশি পাপ করছিস্ । তোর নরকেও ঠাঁই হবেনা । আমি পশুদের একবারে মারি বলির পশুর মতন এক কোপে । আর তুই ধীরে ধীরে প্রাণ নিস্ । ওরা জানেও না যে তুই ওদের হাতে চুরুটের নামে বিষতীরের ফলা তুলে দিস্ ! ওদের বলিস্ যে তোরা নিকোটিন কম আর ভেষজ বেশি দিস্ আর তাই শুনে ওরা বেশি করে কেনে কিন্তু আমি জানি যে তোরা আসলে ওতে ড্রাগ্স্ মেলাস্ ।

তারপর শুরু হতো বাউন্সারের অত্যাচার । মার । মেরে ওর মাকে শুইয়ে দিতো ওর বাবা, ঘাসিলিং । পুরো ১০০ শতাংশ যোগব্যায়াম আর কুস্তির বিদ্যা প্রয়োগ করতো পত্নীর দেহের ওপরে । যেন বৌ তার অপোনেন্ট !

বলতো :: এবার শুধু শিকার নয় , তোর হাড় দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো।

আভার মা আলাদা চলে যায় । পরে সন্তানদের ক্রীতদাস করে পাঠিয়ে দেয় দূরদেশে । কীইবা করবে

সে ? এতগুলি সন্তান নিয়ে একার রোজগারে কি চলে ? তাও স্বল্প কিছু আয় দিয়ে ?

বরং অন্যদেশে গেলে বাচ্চাগুলি বেঁচে-বর্তে থাকবে !

এইরকম ভায়োলেন্ট পরিবারের মেয়ে আভা চো ।

যে চৈনিক কিনা কেউ জানেনা ।

স্বেচ্ছাচারী, পালোয়ান ও মুডি বাবার জীবনটাও একটা জীবন বটে ! মনে হয় আভার । তাই হয়ত আভা ওর বাবা, চুরুট বাঁধিয়ে মা ও বিষ ব্যবসাদার স্বামীর ভুলের মাশুল দিচ্ছে এইভাবে কালার থেরাপি করে ও মাটির ইকো ফ্রেন্ডলি বস্তু বেচে । ওর বংশের ব্যালেন্স শিটে কিছু পুণ্যর এন্ট্রি করছে ।

আভার মৃতদেহর পাশেই দুলছে ওর আআ । একটি দোল্‌নায় । গুলমোহর গাছের কাছে বাঁধা একটি দোল্‌না । সেখানে ঝুলন্ত, আভার চেতনা । কনশাস্‌নেস্‌ । দর্শনে বলা হয় যে আমাদের শরীরের মধ্যে আমাদের মন -এই ধারণা ভ্রান্ত । আসলে আমাদের মনের অন্দরেই আমাদের দেহ । দেহও আরেকটি থট্‌ । সলিড থট্‌ ।

তাই বুঝি দেহ গেলেও মনটা দুলছে ঐ দোল্‌নাতে । চেতনা ঝুলে পড়েছে !

আর ফুলঝুরির মতন চিন্তার স্ফুলিঙ্গ এদিক ওদিকে ভেসে যাচ্ছে । তারাবাজি । আমাদের মন আসলে তারাবাজি । পুড়তে পুড়তে একসময় অবিনশ্বর আলো হয়ে যায় । শেষ স্ফুলিঙ্গ উড়ে গেলেই !

পাঠকের কি জানা আছে যে প্রতিটি চরিত্রের জার্নি, রক্তমাংসের মানুষের জীবনযাত্রার চেয়ে কিছু কম আকর্ষক নয় ? আর তাই হয়ত ক্যারেক্টরদের ঠিক ততটাই ফ্রিডম্‌ প্রাপ্য যতটা মানুষের নিজের ! লেখকের এত স্পর্ধা কোথার থেকে আসে যে ওদের রেখাবন্দী করে ফেলে ? তাই বুঝি , চরিত্ররা স্বাধীনতার লড়াইয়ে নেমেছে ! ওরা চাইছে- ওদের প্রতিটি ডায়মেনশান যেন খুলে রাখা হয় । ওরা স্রষ্টার তুলিরেখায় বাঁধা থাকতে অনিচ্ছুক । ওরা ফ্রি -স্পেস চায় । তাই আমি আভাকে এতটা ফ্রিডম্‌ দিচ্ছি । এখানে আমার ইগোর চেয়ে আভার ইগোকে আমি বেশি সম্মান দেবো । আমি ওকে আবার গড়ে তুলবো, হ্যাঁ- এই একই নভেলায় ! অণু উপন্যাসের বিচ্ছুরণে ।

স্পেক্ট্রামের আভা সে এখন । আকরিক বর্ণালি !

আভার বাবার একটি পাতানো পুত্রও ছিলো । তার নাম পানাদা। তাকে- বছরখানেক বয়সে ,বনে কুড়িয়ে পেয়েছিলো ওর বাবা । লোকে অবশ্য বলে যে সে আসলে আভার বাবারই অবৈধ সন্তান । কার গর্ভে সে জন্মেছে সেটা কেউ জানেনা । ওর মা ঐ ছেলেকে নিজের সংসারে রেখেছিলো । পানাদা ভালো মানুষ । সহজ সরল ছেলে । আগে তো বনে, ও হাতির সাথে বেড়ে উঠেছিলো । একটি হাতির পালের সাথে । কটি বাচ্চা হাতিও ছিলো । পরে ওদের নিয়ে গেলো লোকেরা, কতগুলি মন্দিরে রাখবে বলে । ওদের দেশে ধর্মস্থানে হাতি ছিলো । যদিও মিলিটারির শাসনে এগুলি বন্ধ করার চেষ্টা হয় তবুও কিছু কিছু প্রভাবশালী , বর্ধিষ্ণু পরিবার তাদের প্রাইভেট মন্দিরে একটি করে হাতি রাখতো । সেই হাতি রোজ দুইবেলা ভক্তদের মাথায় শূঁড় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করতো । মন্দিরের মোটা ইন্‌কাম হতো কারণ ভক্তরা এর বদলে টাকা দিতো ।

অনেকে বলতো যে জংলী হাতির কী অধ্যাত্মিক শক্তি থাকতে পারে তা ঈশ্বরই জানেন !

পানাদা ; বনে হাতির সাথে বেড়ে ওঠায় ওকেও নিয়ে যায় মন্দিরের লোকেরা । ও সেখানে হাতির দেখাশোনা

করতো । কারণ ওকে হাতিটি, শৈশব থেকে দেখেছে ও চেনে । হাতি খুব বুদ্ধিমান পশু । তাই পরিচিত মাহুত হলে সুবিধেই হবে । কাজেই পানাদা ওখানে কাজে লেগে পড়ে । আভার মা ওকে প্রথমে যেতে দিতে চায়নি, এত্তো বড় পশুর কাছে ।

বলতো :: **যখন ছোট ছিলো ও, তখন হাতিও বাচ্চাই ছিলো । এখন সে পাহাড় প্রমাণ । পানাদাকে এক জখমেই, খতম্ করে দিতে পারবে ।**

কিন্তু আভার বাবা ঘাসিলিং আর পানাদা নিজেও মন্দিরে যাবার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলো বলেই শেষরক্ষা হলনা ।

একদিন শুভ না অশুভ লগনে পানাদা চলে গেলো মন্দিরে । প্রথমদিকে ভালই ছিলো । পরে গাঁজার নেশায় ধরে । ততদিনে আভার বাবা শিকারের নেশা ছেড়ে পোচারের কাজ শুরু করেছে । অর্থাৎ চোরাশিকারি । এতে অনেক পয়সা হয় । একই শিকার করে **অনেক অনেক** টাকা লাভ হয় । বর্ডার পার করার অন্য লোক আছে । তাদের অনেকেই সমাজের ওপরতলার মানুষ ও বাউন্সার ।

জলের মতন টাকা আসতে থাকে ওর বাবার চোরা কুঠুরিতে । খালি মদ আর পশুহত্যা । এইভাবেই

চলতো জীবন । মা আলাদা হয়ে গেলো । পানাদা চলে গেলো মন্দিরে । ওরা সবাই ভিনদেশে , ক্রীতদাস হয়ে ।

আজকাল ক্রমবর্দ্ধমান মিডিয়ার দৌলতে তো নানান জিনিস দেখা যায় । সেভাবেই কোনো লোকমাধ্যমের কৃপায়, আভার বাবার নাম পৌঁছে যায় এক ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্ম মেকারের কানে । এইরকম দূর্ধর্ষ শিকারি ও বাউন্সারের জীবনের ওপরে সিনেমা করতে সেই মেয়ে বদ্ধপরিকর । বিদেশী মেয়ে, সোনালী চুলের **হারপারই** ওর বাবাকে একপ্রকার ফিরিয়ে আনে সভ্যতায় । তার জীবনের ওপরে সিনেমা করার বাসনা নিয়ে গেলেও, ফিরে আসে বিজয়িনীর হাসি হেসে ।

কারণ জীবনটা বদলে দিতে পেরেছে নায়কের ; সিনেমার বাইরে । ঘাসিলিং এখন এক সুস্থ সবল সাধারণ মানুষ । তার উচ্চাশা আর পালোয়ান গিরির নেশা তাকে ছেড়ে চলে গেছে ঠিক আভাদেরই মতন ।

পানাদা তো মন্দিরে কাজ করতেই ব্যস্ত । ছেলেটিকে ঠিক মতন পয়সা দিতো না মন্দির কমিটি । অতিরিক্ত পরিশ্রম করাতো । হয়ত তাই ও গাঁজা সেবন শুরু করে । ইউফোরিয়ার লোভে । সব ভুলে থাকা । বিষাদ রেণুর, পুষ্পে রূপান্তর !

হাতির সাথে ভালই সখ্যতা ছিলো পানাদার তবুও কোনো এক অশুভ লগ্নে সেই হাতির পদতলে পিষ্ট হয়েই নিহত হয় ছেলেটি । ভালোমানুষের পোর দেহটা, একটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলা পপকর্ণের প্যাকেটের মতন পড়েছিলো --লগ্নভ্রষ্ট মন্দিরে এক ব্রতচ্যুত ক্ষ্যাপা পশুর কারণে । দিনের পর দিন অসহ্য রোদে বাঁধা থেকে থেকে পশুটি ক্ষেপে ওঠে । নির্মম আঘাত হানে, শৈশবের সখার দেহে । পানাদার দেহটি ; ওর পালক পিতার কুস্তির কোপে পড়া কোনো মানুষের- ভগ্ন দেহাংশের মতন পড়ে ছিলো । একেই বুঝি বলে কর্মের বৃত্তাকারে ঘোরা । বাউন্সারের ; শুন্যে ছোঁড়া প্রতিটি ঘুষি বাউন্স করে, ফিরে এসেছে পুত্রের দেহে । হোক্ না পালিত পুত্র , আত্মজ তো বটেই !

হাতিকে নিয়ে গেছে বনবিভাগ । ওকে মেরে ফেলার কাজ পড়েছে আভার বাবার ওপরে । শিকারি হিসেবে আগে তো তার নাম ছিলো । এই ক্ষ্যাপাটে হাতির মুখোমুখি হতে কেউ রাজি নয় আসলে ।

সেদিনই বোধকরি সার্থক হল ঘাসিলিং এর শিকার । কে জানে !

ঘাসিলিং, ততদিনে গাছের কাঠ কেটে মানে কান্ডটা কেটে তার ভেতরটা চেঁচে নিয়ে, বড় বড় পাইপ নির্মাণের কাজে লেগেছে । ঐ অঞ্চলে এগুলি হয় । সেই কাঠের অংশ দিয়ে ওরা এক আজব ড্রাম মানে বাদ্যযন্ত্র বানায় । ওর বাবা ঐ ড্রাম তৈরির কাজ কিছুদিন করে । কিন্তু সুরেলা ড্রাম তাকে বাঁধতে পারেনি । কারণ আভার মায়ের ভাষায় **ঘাসিলিং তার স্বামী হলেও ছিলো আসলে এক অসুর !**

সুরের মূর্চ্ছণায় অস্বস্তি হত ঘাসিলিং এর । বুকে কষ্ট হত । কোনোদিন গান করেনি সে । গান টান মনে হত সময় নষ্ট আর কান্না । দূর্বল মানুষ ; গলা দিয়ে প্যানপ্যানে সব আওয়াজ বার করে বসে বসে- যাকে অনেকে গান আখ্যা দেয় ! আর ক্লাসিক্যাল গান মানে কতগুলো বুড়োবুড়ির বসে বসে, একগাদা ড্রাম নিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কনস্ট্যান্ট গলা কাঁপানো । অনেকটা বনের বাঁদরদের মতন ।

ঘাসিলিং এর জীবনদর্শন ভিন্ন । তাই তো সে পালোয়ান । দেহই তার মন্দির-মসজিদ্ ।

কাজেই শিকার গেলো, এলো চোরাশিকার, ড্রাম গেলো এলো নৌকো । ওদিকে বাঁশ দিয়ে একধরণের নৌকো তৈরি হত যা দেখতে কিছুটা বাটির মতন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটি ! এই জনা চারেক সওয়ারি বসে ওতে, মাঝি ছাড়া । সেই নৌকো নির্মাণের কাজ নিয়ে তীরে তরী বাঁধলো ঘাসিলিং । স্রেফ ঐ মহিলা ফিল্মমেকারের পাল্লায় পড়ে ! জলস্রোতে যখন টাট্‌কা নৌকোগুলি ভাসতো তখন ভীনদেশী যুবতী হারপারের মনে হত যে সিনেমার অশেষ ক্ষমতা । সিনেমা কেবল বিনোদন নয় রূপালী এই ঢেউ মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে । এক যন্ত্রমানবকে করে তুলতে পারে স্পর্শকাতর ।

বাউন্সারকে, সেন্সিটিভ এক মানুষ । যে একটি ঘাসপোকাও আর টিপে টিপে মারবে না । কোনো দিনই । ঘাসিলিং আজ ঘাস হয়ে গেছে । সতেজ ঘাস । তাই বুঝি ঘাসপোকার বেদনা সে বোঝে । ঘাসজীবনের কথাকলি রচনা করে- এই শক্তিমানের অমল মন ।

ছায়াছবি শুধু স্বপ্নের জগৎ নয় । এইধারা, ছায়ামানুষকে রক্তমাংসের মানবে পরিণত করতে সক্ষম । সত্যি , হারপারের জীবনই তার প্রমাণ । অনেকটা আমাদের ছায়াপুরুষ সাধনার মতন । নিজ ছায়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো । ধীরে ধীরে সেই ছায়ায় স্বচ্ছতা আসবে , রং আসবে, আসবে থ্রি -ডায়মেনশান । মনে হবে নিজেরই ক্লোনের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি ! এই ক্লোনিং করতে সায়েন্স লাগেনা !

পাঠকের কী মনে হয় ? এখানে ঘাসিলিং এর চরিত্রে আর কী কী রং থাকতো ? কোন কোন জায়গায় তার রং চটে গেছে ? আমার মনে হয় পাঠকের নিজ কল্পনায়, ঘাসিলিং আরো জীবন্ত হবে । আরো সাবলীল । এমন কোনো ঘাসিলিং যার সঙ্গে কোনো কোনো পাঠক রিলেট করবেন । কাছের মানুষ বলা যাবে হয়ত । আমি পাঠকদের কাছে মিনতি করছি , ঘাসিলিং এর

কথা আমাকেও একটু শোনান , কোন সুরে বাজছে তার বাঁশের বাঁশি ? পাঠকের অবচেতনে ?

যাকে **পানাদার মা** বলে লোকে সন্দেহ করতো সেই মহিলার নাম ছেল্লম্ । সে এক অদ্ভূত মহিলা । তার সারাদেহে কোথাও বিন্দুমাত্র সততা নেই ।

এক আজব খিচুড়ি রেঁধে এনে, তাও ফুটপাথে বসে বসে , ঘাসিলিংকে জোর করে রোজ খেতে দিতো । বলতো :: **না খেলে আমি আত্মহত্যা করবো ।**

সেই অখাদ্য খেয়ে খেয়ে ঘাসিলিং এর এখন তখন অবস্থা হত । কারণ ভোজন করার জন্য উপাদেয় তো নয়ই আর স্বাস্থ্যকরও নয় । অর্ধসেদ্ধ চাল ও ডালে মেলানো এক জগা-খিচুড়ি যার মধ্যে তেতো সবজি ও শক্ত আলু দেওয়া । কখনো তার সাথে আসতো বেগুনের বোঁটার সবজি । সেও অখাদ্য আর অর্ধপাক করা । ঘাসিলিং খেয়ে নিতো কেন, কেউ জানেনা হয়ত মনে রসের সঞ্চার হয়েছিলো এই কুরূপা নারীর জন্য । আভার মায়ের সাথে রোজই ঝগড়া হত শিকার নিয়ে । তখনই **ছেল্লম্ স্টেজে নামে** একেবারে অখাদ্য কুখাদ্য নিয়েই ! আসলে খুব ক্ষিদে পেলে তখন মনে হয় যে যা খাচ্ছি তাই অমৃত ! সেই লজিক হয়ত- ছেল্লম্ এর

প্রতি টানের , ঘাসিলিং এর । তবে এই সম্পর্কই পানাদার সৃষ্টি করেছে কিনা সেই বিষয়ে লোকে কানাঘুষো করলেও একমাত্র **ডিএনএ** টেস্টই বলতে পারবে এই তথ্য ঠিক না বেঠিক ।

ঘাসিলিং এর বীর্যপাত, বনপথে- সে এক পাগলাঝোরার কিনারায় । সেই বীর্য নিয়ে তন্ত্রমন্ত্র করে তা থেকে পানাদার আবির্ভাব । এইসব গবেষণা আর বিজ্ঞানের বিষয় । সমাজের কাজ কুৎসা রটানো । আর আসল সত্য জানে কেবল ঘাসিলিং আর ছেল্লম্ ।

ঘাসিলিং তো পালোয়ান হওয়ার সময় থেকে প্রচুর কলা খেতে অভ্যস্থ কাজেই ছেল্লম্ তাকে অনেক কলা পেড়ে এনে খাওয়াতো । ছেল্লম্ আবার ওদের এলাকার পুরুষদের সাথে, পয়সার বিনিময়ে শুয়ে পড়তো তবে একে কেউ বেশ্যাবৃত্তি বলেনা । যেসব পুরুষ একা, তারা ছেল্লমের মতন নারীকে ভাড়া নিয়ে কয়েকঘন্টা শুতে পারে তবে সাথে লোক থাকে । নারীটি কেবল পুরুষের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে অভ্যস্থ । একে ওরা বলে সুইয়াল্ । ছেল্লম্ এই সুইয়াল্ এর কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করতো আর দিনের বেলায় বনে জঙ্গলে ঘুরে, পক্ষীশাবক খুঁজে নিয়ে তাকে বড় করে জ্যোতিষ করতো । একটা খাঁচা বানিয়ে

সেখানে বুনো পাখি ভরে ভাগ্য বলতো । পাখিটি এসে দানা খুঁটে খেতে খেতে একটি বিশেষ দানায় মুখ দিলেই সৌভাগ্য আর নাহলে দূর্ভাগ্য এইভাবে কপাল পড়া হত । লোকে, নিতান্তই মূর্খ নাহলে বুঝতো যে এগুলি লোকঠকানো ভাগ্যগণনা । তবুও কিছুটা দয়াতেই তারা ছেল্লম্‌কে পয়সা দিয়ে যেতো ।

--আহা রে , গরীব মেয়েমানুষ ।

ছেল্লম্ কে দুটি প্রশ্ন করলে একটির জবাব দিতো ।

আর অনর্গল মিথ্যে কথা বলতে পারতো ।

পানাদা তারই গর্ভজাত সন্তান কিনা জানতে চাইলে কাউকে বলতো হ্যাঁ , কেউ শুনতো না আবার কেউ জানতো যে হতেও পারে ।

পানাদা হাতির পদপিষ্ট হবার পরই ছেল্লম্ ওর পোষা পাখিগুলিকে উড়িয়ে দেয় । ভাগ্যগণনা বন্ধই করে দেয় একেবারে । শুধু সুইয়াল্ কাজের মাধ্যমে নিজের জীবন চালিয়ে যেতে থাকে । লোকের মাথায় হাত বোলানো । অর্থের বিনিময়ে । আসলে সবারই কাছের মানুষ হারিয়ে গেছে । তাই গায়ে মাথায় হাত বুলাবার কেউ নেই । আজকাল সেটাও পয়সা দিয়ে কিনতে হচ্ছে ।

তাতে সুবিধে হচ্ছে ছেল্লমের মতন মহিলাদের । অর্ধ মানবী হয়ে কাজ করছে তারা ।

ঘাসিলিং আর ছেল্লম্ কোনোদিনই বিবাহ করেনি । আসলে ওরা একে অপরের প্রেমাস্পদ ছিলো কিনা তাও কেউ জানেনা । ওরা একজন অন্যজনকে খেতে দিতো, সাহায্য করতো ইত্যাদি ।

সেই সম্পর্কের গোড়ার কথা কেউ জানেনা ।

আর পানাদা মারা যাবার পর ছেল্লম্ খুব কান্নাকাটি করতো । পাখিদের উড়িয়ে দেয় মুক্ত আকাশে ।

জীবনটা একেবারে ভিন্নপথে চালিত করে ।

মিথ্যে কথা নাকি একেবারেই বলতো না । অতিরিক্ত সত্যের বোঝা বইতে বইতে মাথা খারাপও হয়ে যায় কিঞ্চিৎ । শেষদিন অবধি অবশ্য ঘাসিলিং সঙ্গেই ছিলো । ছায়ার মতন ।

আভা চো-র বাবা ঘাসিলিং এর এইরকম জীবন ছিলো ঠিক । জীবনের বল্কল ছিলো সতেজ আর মজবুত ।

শেষ সময়ে স্বীকার করে গেছে যে পানাদা ওরই সন্তান । আর তার মা ছেল্লম্ নয় । হারপার তার আসল মা । কিন্তু শিশু অবস্থায় হাতি নয়, মানুষ করেছে ছেল্লম্-ই । পরে আভা চোয়ের মা । হারপারের ফিল্ম করার সময় নয় আরো বহু আগে ওদের ঘনিষ্ঠতা হয় । হারপার তখন ছাত্রী । বিশ্ব ঘুরতে বেরিয়েছে । ওকে আকৃষ্ট করে ঘাসিলিং এর সাহস, পৌরুষ, ম্যাচো স্বভাব । হারপারের মনে হয় এমন একজনের সঙ্গ পাওয়া লাকের ব্যাপারে । আর অনেক সাদা মেয়েই যা করে তাই করেছে হারপার । প্রেমিকের শয্যা নিয়মিত ভাগ করেছে । গর্ভপাত করাতে উদ্যত হলে ঘাসিলিং বাচ্চাটাকে রাখতে বলে আর জন্মাবার সাথে সাথে ছেল্লম্‌কে দিয়ে আসে । গল্প বা সত্য এইটুকুই ।

আভা চো তো এখন মৃতা । খুন হয়েছে হঠাৎ !

তাকে কবর দেওয়া হবে । পোড়ানো হবেনা । কারণ তার মন পোড়ে আগুনের লেলিহান শিখায় । দেহ পোড়েনা । কিন্তু কে ওকে খুন করলো ? কোনো পুরনো , লুকানো শত্রু ? ওর বাবা, মা কিংবা পতিদেবের ?

গুলমোহর গাছ রূপী গুলনার খুব হেসে ওঠে । তারপর বলে :: **আধুনিকা , ধরতে পারলে না তো ?**

ওকে খুন করেছে ওর একাকীত্ব ! লোনলিনেস্ ।

তোমাদের স্বার্থপর, ভোগবাদের সমাজের বিযুক্ত মানুষ । যারা ওর জীবনে লোনলিনেস্ নিয়ে এসেছে ।

ও কেন পরিবার ত্যাগ করে এসেছিলো জানো ? কারণ ওখানে সবাই পুতুল । কেউ মানুষ নয় !

ওরা আভিজাত্যের দাস , ধনসম্পদের নেশায় উন্মাদ । ওদের আবেগ নেই । লজ্জা নেই । ওরা কাঁদেও না । পাছে মেক আপ চটে যায় !

আমি দেখলাম যে আভার মৃত শরীর থেকে উঠে এলো আরেক আভা ! সে তার স্বপ্নের আভা । নিজেকে সে যে আকারে দেখতে চেয়েছিলো । এই ঘৃণ্য জীবন তো সে চায়নি ! কেউই বা চায় ? ঘৃণা আষ্টেপৃটে ধরে ।

আভার দিদিমা নিজের চুল বিক্রি করে খেতো । পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা চুল ছিলো তার । সেই চুল দিয়ে পরচুলো হতো । তারপর ওর মা গেলো চুরুটে । ওখানে মেয়েরাও হুইস্কি পান করে , ভাত পচানো মদ খায় আর চুরুট ও সিগারেট খায় । দিদিমা আর মা

দুজনেই খুব চুরুট খেতো । মদ খেতো । মা শেষদিকে একদম খাবার খেতো না , চিন্তায় । খালি স্মোক করতো ।

আভা ওর মাকে **লোটাস্ উইভার** হিসেবে দেখতে চায় । পদ্মফুলের ডাঁটির ভেতরে যে সুতো থাকে তাকে টেনে বার করে কাপড় বোনা হয় ওদের দেশে । সেই ব্যবসায় ওর মা **মাইক্রো ফাইনান্স** নিলে ওর ভালো লাগতো । ও দেখছে ওর মা লোটাস্ উইভার হিসেবে কাজ করছে । ওদের ভাইবোনেদের ক্রীতদাস হতে হয়নি কারণ মায়ের ব্যবসা একদম জমজমাট !

ওদের দেশে লোকে মুখে রং মেখে ঘোরে । আমরা যেমন পাওডার লাগাই সেরকম করে ওরা দুই গালে , কপালে আর থুতনিতে রং মাখে । তবে ওদের রং কিন্তু কেমিক্যাল নয় । গাছের ছাল, ফুল- পাপড়ি আর বিভিন্ন ফলের সমাহার ঐ ভেষজ রং । এগুলি চামড়ার জন্য খুব ভালো । দেখতেও ভালোলাগে । এক একটি রং এক এক রকমের এনার্জি দেয় । লাল মানে তেজ, সবুজ হল শান্তি, হলুদ মানে বন্ধুত্ব আর সাদা মানে নির্মল মন । তবে কালো কেউ লাগায় না । ওটা অশুভ । কিন্তু ওদের ওখানে নাকি কালো বিড়াল শুভ ।

আভা দেখছে যে ওর কাঙ্খিত আভা নাম্নী নারী মুখে নানান রং মেখে পথে ভাসছে । এই আভা কাপড়ের

পুতুল বানায় । ওদের দেশে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির খুব চল । বিশেষ করে উইভিং আর ক্রাফ্ট । ওরা সবাই প্রায় ভাঙা ভাঙা ইংলিশে কথা বলতে পারে এত বিদেশি আসে ওখানে । কাজেই আভার দেহ থেকে সোনালী আভা বার হচ্ছে । ও পুতুল বানায় । হরেক রকমের কাপড়ের পুতুল । সেই কাপড় বোনে ওর মা ---! লোটাস্ উইভিং । ওর ভাইবোনেরা সবাই ওদের ব্যবসায় সাহায্য করে । ওদের এত বড় ব্যবসা হয়েছে যে ওরা এখন মাইক্রো ফাইনান্স এ ভাগ নেয় । লোন দেয় নতুন ব্যবসাদার ও ছোট ব্যবসায়ীদের ।

ওরা কেউ প্রাণঘাতী চুরুটের সাথে যুক্ত নয় ।

আর মুখে রং মেখে বার হলে কালার থেরাপিও হয় । নয়নের আরাম হয় , মন ঠান্ডা হয় । ওরা সবাই মুখে রং চং মেখে হাঁটছে , জনমানবহীন রাজপথে ।

ওর বাবা শিকার করেনা । ওর বাবা এখন দেখা যাচ্ছে ওদের **গ্রাম সাফের** কাজে নিযুক্ত । ওদের গ্রামে কেউ ময়লা ফেলে পথঘাট নোংরা করছে না আর । সবাই **মার ঝাড়ু মার** করে ময়লা তুলে নিচ্ছে । ওর বাবা সেই সংগ্রামের নেতা । ওরা বাউন্সারের কাজ করলেও ওর বাবা **সাফাইকর্মী** হয়ে আছে । শুকনো, ঝরাপাতা, কাঠকুটো যাচ্ছে সারে আর ভাতের ফ্যান , অভুক্ত

খাদ্য বা সবজি পথপাশ থেকে চলে যাচ্ছে কোনো ক্ষুধার্ত পশুর খাদ্য গহ্বরে ।

ওর বাবা সমাজ গড়ছে এখন , ভাঙছে না ।

আর আভার স্বামী একজন অধ্যাপক । যিনি ওদের গ্রামে ঐ সাফাই প্রথা চালু করেছেন । ওটাকে বড় আকার দেয় ওর বাবা , **বাবা বড় কিছু করবেই !**

লোকটাকে সবাই পাগলা বলে । ক্ষ্যাপা ধরণের । রাস্তা থেকে ময়লা তুলে তুলে নিয়ে যেতো । এমন সাফ করার বাসনা । হাইট বেশ কম । চোখে পুরু চশমা । আধময়লা পোশাক আশাক । লোকটা খালি ডোনেট করে আর মানুষের উপকার করে । নিজের জন্য কোনোদিন কিছু করেনি । আভা ওর গলায় বরমাল্য দিচ্ছে । বিষ ব্যবসাদারের গলায় নয় !

সবাই ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছে :: **ওরে শেষপর্যন্ত এক পাগলাকে বিয়ে করলি ?**

শুনে শুনেও আভা হাসছে । খুব হাসছে । মনে মনে বলছে :: সবাই তো পাগল ! কেউ বেশি পাগল কেউ কম পাগল । কোনো পাগল চেনে বাঁধা থাকে আর কেউবা ঘুরে বেড়ায় , হেথায় সেথায় ।

আর কি ? আর হারপারে গর্ভজাত ওর ছোট্ট ভাই পানাদা, পরিত্যক্ত শিশু নয় ! আধুনিক যুগে ওকে গর্ভ থেকে গর্ভে ট্রান্সফার করা হয়েছে । **ফ্রম হারপার, টু ছেল্লম্ এর গর্ভে ট্রান্সফার । ভ্রূণ সংযোজন !**

আভার ; কল্পিত আভার ছটায় নিজেকে দেখার চেষ্টা করছি !

আমার আভাটা , গার্গীটা কেমন হবে ? গার্গী ছায়া -- গার্গীর প্রতিবিম্ব ??

স্রষ্টারা বুঝি সৃষ্টির মায়াস্পর্শে একসময় নিজেরাই চরিত্র হয়ে যায় , তাই না ?

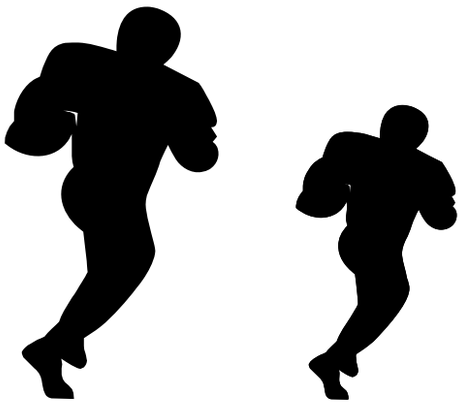

হেমাটে

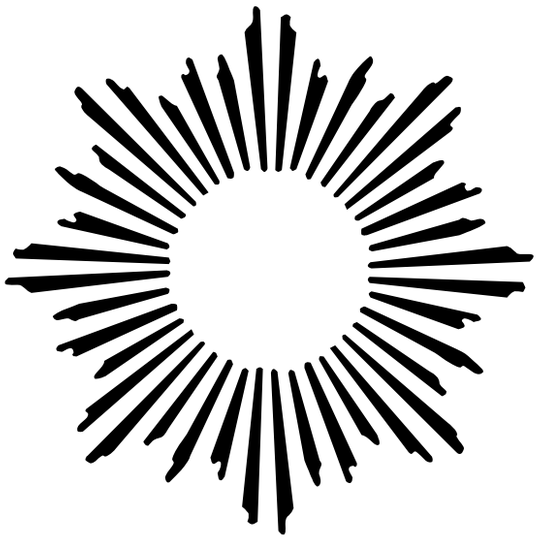

হেমাটে

ব্লগ ধাঁচে রচিত

তামাটে যেমন তামার রং সেরকম হেমাটে হল হেমার রং । সোনালি নয় কিন্তু ! হেমা এক নারী আর তার সঙ্গে থেকে থেকে কয়েকটি সাহেবের বাচ্চা হয়ে উঠেছে হেমাটে । হেমাইশ্ । হেমার গায়ের গন্ধ মেখে ওরা সবাই আজ হেমাটে ।

হেমা আজ কথা বলে না । কথা ফুরিয়ে গেছে । হয়ত তাই ব্লগ লিখতে লিখতে আলাপ হয় লেখকের সাথে ।

হেমার ভান্ডারে যে এত শব্দ ছিলো তা সে নিজেও কোনোদিন আঁচ করেনি । এবার হেমার গল্প লিখবে কোনো এক লেখক , তার জীবন আলেখ্য উঠে আসবে অপরিচিত ক্যানভাসে । সবাই পড়বে ।

জানবে কেমন মৌনমুখর, হেমার জীবন !

আজ থেকে অনেক বছর আগে শ্রীলঙ্কার এক নগরে বাস করতো একটি পরিবার । বাবা মধুশঙ্খ ছিলো ট্যাক্স কনসালট্যান্ট । আয়কর কর্মী । ভদ্রলোকের দুটি মেয়ে । হেমা আর হিতা । হেমা বড় আর হিতা ছোট । হেমার গাত্রবর্ণ বেশ কালো । হিতা অপরূপা । তবে দুজনকেই একরকম দেখতে ।

এলাকার বণিক ময়ূরধ্বজ পছন্দ করেছিলো হিতাকেই । যে কেউ করবে । কৈশোর থেকেই ছিলো বাক্‌দত্তা , বাক্‌পটু হিতা । পরিবারের সবার ইচ্ছে যে হিতা ঐ বণিকের ঘরণী হয় । ময়ূর খুব চোস্ত ছেলে । অল্পবয়সেই সে মালয়, ফিজি ইত্যাদি দেশে ব্যবসাদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো । অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে তোলে এক অনবদ্য সাম্রাজ্য ! কিন্তু একটি অটো-ইমিউন অসুখে তার চোখ দুটি অন্ধ হয়ে যায় । কমবয়সে অন্ধত্বে পা দেওয়া মানুষটি তবুও প্রেয়সীকেই স্ত্রী হিসেবে পায় । হিতা তাকেই বিয়ে করে কথামতন । কারণ ময়ূরধ্বজ অত্যন্ত ধনী । তাই চিরতরে আঁধারে ডুবে গেলেও মনটা একটু আনন্দে ভরা ছিলো । সুখে দু:খে হিতা আছে একান্তই হিতাকাঙ্খী হয়ে ! তার আঁখিপল্লব হয়ত ব্ল্যাক আউটের কবলে তাতে কী ? অজস্র চাকর বাকর আর

অট্টালিকায় যারা থাকে তাদের সবকিছু করে দেবার মানুষ থাকেই । কাজেই পত্নী হিতার জীবনও কেটে যাচ্ছিলো সুন্দরভাবেই । ময়ূরধ্বজ তো ব্রেল শেখার চেষ্টা করছিলো । ব্রেল আদতে মিলিটারিতে, সৈনিকদের পাঠানো এক ধরণের কোডের ওপরে ভিত্তি করে সৃষ্ট । ওকে বলে **Night writing -** আলোবিহীন পরিস্থিতিতে এই সিগন্যাল পাঠানো যেতো যুদ্ধের সময় । যদিও এখন এই অক্ষর ব্যবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ ।

বাধ সাধলো বৌ গর্ভবতী হওয়াতে । হঠাৎ পদস্খলন ঘটলো বেড়াতে গিয়ে । এক লোকাল চা বাগানে ।

সেফ্ সেক্স করতে অভ্যস্থ হিতা অচিরেই গর্ভবতী হল । সবুজ সবুজ চা বাগানের আশ্চর্য আলোতে মদিরাবতী হিতা মেতে উঠেছিলো প্রকৃতির নগ্ন খেলায় । এরকম হয় । কখনো কখনো । এইভাবেই শুরু হয় প্রতিটি বাঁধভাঙার খেলা । এইভাবেই ভাঙে অপরাহ্নের গাঢ় আলো ।

সাঁঝবেলায় কিছু এলোমেলো কথায় হিতার মনে রং লাগে ! আসমানি সেই রং । আর তখনই স্খলিত বসনে ওঠে হিল্লোল ।

আর তারপর চিরবিচ্ছেদ । সন্তান গর্ভে নিয়েই !

আসলে **আসল হিতা** তো কোনোদিনই তার স্বামীর ঘর করেনি ! যে করেছিলো সে ছিলো হেমা । কালো মেয়ে হেমা । ফর্সা হিতার প্রক্সি । কারণ হিতা ময়ূরধজ্ঞের সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি ব্যবহার করে সুখী হতে চাইলেও অন্ধের শয্যায় যেতে চায়নি । তাই শয্যাসঙ্গিনী হত হেমা । হেমাও ময়ূরধজ্ঞকেই ভালোবেসেছিলো ।

আসলে ঐ বয়সে এরকম রং লাগেই মনে , সবারই । আর পাত্র যদি টল, ডার্ক আর হ্যান্ডসাম হয় , সিগারে পোড়া দুই ঠোঁট , জন আব্রাহামের মতন চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি তাহলে বেশিরভাগ নারীই আকৃষ্ট হবে ! যদিও কপালের ফেরে আজ চোখে আলো নেই আর কোনো ।

হিতার বাবা ও মায়ের ঠিক এইসময়ই মনে হল যে ওরা এতদিন খুব অন্যায় করে এসেছে । জামাতার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে কালো মেয়ে হেমাকে তার শয্যায় নিয়মিত পাঠিয়েছে । কাজেই এবার থেকে সততা আর স্বচ্ছতা !

আসলে হিতা একটু জেদি আর কূট । হিংসুটে । স্বার্থপর । অহঙ্কারী । অন্যদিকে হেমা নিরীহ ।

কাজেই ঠিক এরকমই হবে গল্পটা । কিন্তু টুইস্টটা --

ও হেনরির বদলে গার্গী দিচ্ছে বলে অন্যকিছু হলেও আমরা জানতে পারছি না ।

হিতারূপী হেমা- একদিন ময়ুরধ্বজের সন্তান, গর্ভে নিয়েই অন্য একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় । সেই লোকটি এক সাহেব । নাম কনোর রিড । হ্যাঁ , পিয়ানোর রিড নয় কনোর রিড ।

কনোর সোনালি মানুষ । মেছো । মৎস্য ব্যবসায়ী ।

আগের বৌ, মাছের আঁশটে গন্ধ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে পালিয়ে গেছে ।

কনোরের গা থেকে আঁশটে গন্ধ বার হত । সবসময় মাছ । মাছ আর মাছ । তাই ।

এবার সে দুনিয়া খুঁজে এমন একজনকে বার করতে চেয়েছে যে মাছ খেতে ভালোবাসে আর মৎস্য ব্যবসাদারের স্ত্রী হতে যার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই ।

শুনেছিলো শ্রীলংকার লোক মাছ খায় নানান ভাবে । শুকিয়ে , রেঁধে , পুড়িয়ে । তাই এই অঞ্চলে ঘাঁটি গাড়া । আর হিতার বাবা ঠিক এরকমই এক পাত্রের সন্ধানে ছিলো যে তার বাতিল মেয়ে হেমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে । কাজেই অঙ্ক মিলে গেলো ।

দুইয়ে দুইয়ে চার । কনোর আর হেমার বিয়ে হয়ে গেলো এক উজ্জ্বল সকালে । লোকাল রেজিস্ট্রি অফিসে ।

আসলে এরকম হত যদি এটা গল্প হত । কিন্তু এটা জীবন । গল্প নয় । তাই চিকিৎসা বিজ্ঞান এমন এক চিকিৎসা বার করলো বিদেশে, যা দিয়ে এইধরণের **অটো ইমিউন ডিজিজের** কবলে পড়ে নষ্ট হওয়া চোখ আবার সারিয়ে তোলা যায় । **নিজ দেহের রক্তকণিকা যখন ভুল করে নিজের দেহকেই আক্রমণ করে বসে তখন সেই রোগকে বলে অটো ইমিউন অসুখ ।** এতদিন এর কোনো চিকিৎসা না থাকায় ময়ূরধ্বজ অন্ধত্বের কবলে পড়ে অনেকটা সময় কাটায় কিন্তু ধনী হওয়ায় তার হয়ে কাজ করে দেবার অনেক লোক ছিলো বলেই কেউ একজন সন্ধান দেয় বিদেশের এই চিকিৎসা প্রণালীর । **ময়ূরধ্বজ আঁখির আঁঠায় আবার আলো লাগাতে সক্ষম হয় ।**

সল্‌মা চুমকির মতন । খানিকটা আলো আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে চোখে মেখে নেয় ।

স্বার্থপর হিতা তখন বাবা ও মাকে বলে বসলো যে **হেমাকে তাড়াও আমার বেডরুম থেকে ।**

এখন থেকে আমি ময়ূরের সাথে শোব ।

দুনিয়ায় যত বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে বেশিরভাগই তো মেয়েদের কেন্দ্র করে । অর্থাৎ সেই শোয়া অথবা না শোয়া ! কাজেই !

লক্ষ্মী মেয়ে হেমা তাই কনোরের সাথে শোয় এখন । সেই শোয়া আর না শোয়া ।

আর হিতা ময়ূরধ্বজের সাথে ! কেবল মাঝখান থেকে একটা বাচ্চা তার বাবাকে হারালো চিরতরে ।

একটি নিষ্পাপ কন্যা সন্তান । আবার মেয়ে । এবার তাকে নিয়ে কোন যুদ্ধ হয় দেখা যাক্ !

মেয়েটিকে অবশ্য কনোর মেনে নেয় । কনোর ভালোমানুষ । সোজা মানুষ । আর তার এইসব বাচ্চা টাচচা নিয়ে কোনই উৎসাহ নেই । ওর জগৎ কেবলই মাছের আঁশ দিয়ে সৃষ্ট । মৎস্য ভান্ডারের যত খবর সে জানে আর বোধহয় কোনোকিছুই তত জানেনা । এমনকি সাহেব হয়েও- নারীদেহ সম্পর্কে !

মৎস্যকন্যার খবর হয়ত জানে । আর মানুষের বাচ্চার বদলে মাছের ডিমের গল্প । মানুষের ডিম হয় আর তা ফেটে বাচ্চা জন্মায় এরকমও হয়ত ভাবে । কেজানে !

মেয়েটির নাম তাহানি । মাছের ভেড়িতেই তার বেড়ে ওঠা । ছোট থেকে সেও মাছ খেতে ভালোবাসে । খুব । **কাজেই হেমা আর তাহানি ভালই ছিলো কনোরের গৃহে ।** ছুটিতে ওরা দূরে বেড়াতে যেতো । অন্যসময় বাড়িতে মাছের কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো হেমা ।

একটু বড় হলে দূরে পড়তে গেলো তাহানি ।

লেখাপড়ায় ভালই ছিলো । তবে মৎস্য সম্বন্ধীয় কিছু পড়েনি সে । মাতামহের মতন ট্যাক্স নিয়ে পড়েছে । টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কিং , ফাইন্যান্স এইসব ।

ভালই করেছিলো রেজাল্ট । কাজও ভালো করতো । কিন্তু হঠাৎ ওর মাথায় কী চাপলো দেশ ভ্রমণ করবে । মাতামহ তখনও জীবিত । দিদিমা মারা গেছে ।

ময়ূরধ্বজের সাথে কিংবা হিতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যদিও দাদুর । হিতা এইভাবেই এক এক করে লোককে সরিয়ে দেয় । দিতে অভ্যস্থ । যারা ওর এক বিন্দুও ক্ষতি করতে পারে কখনো । ওর স্বামীর অন্ধত্বের

সময় সহোদরা হেমার , ময়ূরধজ্জের স্ত্রী সাজার কথা **বুড়ো বাপ্ মা** ব্যাতীত কেউ জানেনা । আর হেমা তো কোন সে সুদূর দেশে । বিয়ে করে গেছে আর ফেরেওনি । অনেক বছর তো হয়ে গেছে ! ওর বিয়ে করা স্বামী কনোর তো সবই জানতো । কাজেই সে সুখেই আছে । শিশুটিকে নাকি কনোর মেনে নিয়েছে । ভালই আছে তারা । লোকেও জানে যে তাহানি আদতে কনোর আর হেমার সন্তান ।

হিতা তো সেই অর্থ কারো কোনো ক্ষতি করেনি !

আজ হিতার তিনখানা সন্তান । ওরাও ভালই আছে ।

হিতার বিবেকও সাফ । হেমার হিতেই এমন হয়েছে । নাহলে একটি কালো, কুৎসিত মেয়ে কি এরকম এক সাহেবকে পতিরূপে কখনো পেতো ?

তাহানি দাদুর কাছে ছিলো । নিজ জন্ম রহস্য নিয়ে কিছু জানতে চায়নি কারণ ওর জন্মে যে কোনো রহস্য থাকতে পারে , ও তা কল্পনা করতেও অক্ষম ।

ওর বাবা একজন হোয়াইট অস্ত্রাপ্রাণর । যিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত । মাছের কম্পিটিশানে বহুবার ন্যাশেনাল প্রাইজ পেয়েছেন । আর মাও নিজ ইচ্ছায় বিজনেসে সাহায্য

করেন । মায়ের মৎস্যপ্রেমই, তার বাবাকে কাছে টেনে এনেছে সুদূর বিদেশ থেকে -শ্রীলংকার বুকে !

গ্লোবালাইজেশানের যুগে ।

এর মধ্যে আবার রহস্য কী ?

তাহানি অবশ্যই বড়লোকের আদুরে মেয়ে । ওকে কেউ কোনোদিন বকেনি । এখন ক্রেডিট কার্ড নিয়ে নাইট ক্লাবে যায় । তারপর বিল ভরে বাবা ও মা ।

বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ ফূর্তি না করলে যৌবন কাটাবে কী করে ? নিত্যনতুন বয়ফ্রেন্ড তার । একরাত শুয়ে তারপরে নোংরা পোশাকের মতন ফেলে দেয় । **সেই শোয়া আর না শোয়া ।**

কেউ প্রশ্ন করলে বলে : **নো কমেন্টস্ । অ্যাম আই আ হোর্ ? জানো আমি কার মেয়ে ?**

আদতে এশিয়ার রক্তও আছে শরীরে । তাই কার মেয়ে, কার নাত্নি এগুলি হয়ত এখনও মনে বাসা বেঁধে আছে । পরের জেনেরেশান এলেই , যদি আসে কখনো সেই শোয়া থেকে অথবা আধুনিক ল্যাবে ; তাহলে তার

এইসব অভ্যাস হয়ত চলে যাবে । এখন তাহানির ক্ষেত্রে এগুলি আমাদের সহ্য করতে হবে ।

কার মেয়ে , কার নাত্নি এইসব কথামালা ।

হেমার জীবনটা নিয়ে লিখতে গেলে দেখা যাবে যে তার জীবনের গতিবিধি আমরা সেভাবে বুঝতে পারছি না । সময়টা লিনিয়ার নয় । একসাথে অনেক ঘটনা দেখা যাচ্ছে তার জীবনে । নিজেদের সাজাতে হবে ।

হেমার প্রথমদিকে কালচারাল শক্ হয়েছে । অন্য সংস্কৃতি, অন্যরকম অভ্যাস সব বদলাতে হয়েছে ।

ভাষা আলাদা, খাবার দাবার ভিন্ন- কেবল মাছটুকু ছাড়া ! লোকে এখানে বেশি গায়ে পড়া নয় । কমিউনিটি হেল্প আছে সবার । কেউ কারো বাড়ি হট্ করে চলে যায়না ।

তবে ক্লোজ বলতে বন্ধুবান্ধব, সন্তানরা । বর-বৌ অথবা পার্টনার ভাগ্য সবার ভালো নয় । কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা কমিউনিটির লোক, গীর্জার বন্ধুরা সাহায্য করে । একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে সবার বাস । পুলিশ, হাসপাতাল সব ভীষণ সক্রিয় । কাজেই পুষিয়ে যায় । শুধু একাকীত্ব

কাটেনা অনেকের যারা এদের কালচারে ডুবে যেতে অক্ষম !

মেয়ে তাহানি মেধাবী হলেও বর্তমানে কোনো কাজ করেনা । পৈত্রিক একটি বাড়িতে থাকে । একটি সবুজ স্তূপের ওপরে লম্বা একটি বাড়ি । একটাই হলঘর । সেখানে আলমারি দিয়ে দেওয়াল করা । এক কোণায় একটি কিচেন করেছে । রান্না বলতে সসেজ ভাজা আর স্যান্ডউইচ্ বানানো । বাবার সমস্ত সম্পত্তি মা বিক্রি করে দিয়েছে । কারণ অনেক দেনা হয়ে গিয়েছিলো । বাবার মৃত্যু হল হৃদরোগে । হঠাৎ । বয়স বেশি হয়নি । ষাটও হয়নি । বিদেশে এগুলি কোনো বয়সই নয় ।

মা একা সব ব্যবসা সামলাতে অক্ষম বলেই সমস্ত বিক্রি হয়ে গেলো । আর দেনা তো ছিলই । তাহানি তো কোনো কাজ করেনা । এই প্রপার্টিটা ও বেচতে দেয়নি । বাবার শেষ চিহ্ন বলে । কিন্তু এটা নামেই বাড়ি । কেবল লম্বা একটা হলঘর- এক সবুজ মাটির স্তূপের ওপরে । একটু গ্রামের দিকে তাই বিক্রি করাও মুস্কিল বলে মাও তেমন গা করেনি । **এখন এখানে তাহানি একাই থাকে আর রাতে বন্ধুরা আসে । আগের থেকে অনেক কম আসে তারা ।**

কাউন্সিল থেকেও কামায় কিছু অর্থ । বাইরের ঘাস কাটে না । সামর্থ্য নেই ; গায়ে অত জোরও নেই আদরের দুলালীর । কাজেই বড় বড় ঘাস হয়ে থাকে । ওকে প্রায়ই এর জন্য গরাদের আড়ালে যেতে হয় ৬ মাস করে । এখানে এই নিয়ম । আর ও-ও ; ৬ মাস শান্তিতে থাকে । খাওয়াপরার কোনো চিন্তা নেই ।

যেকোনো কাজ তো সে করবে না । ও কার মেয়ে কেউ কি জানেনা ? এককালীন সফল ব্যবসাদার (মাছের) যিনি অনেক জাতীয় প্রাইজ পেয়েছেন মৎস্যের জন্য!

ওদিকে হেমা তো বুড়িয়ে গেছে । আমাদের এদিককার মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি । আগে কনোরের সাথে কতনা রোমান্টিক মৎস্য অভিযানে গেছে হেমা । রাতভর স্যামোন মাছের বৃষ্টি । অসাধারণ সব ঘটনা ।

গভীর সমুদ্রে মধুজোছনা মেখে, মাছের নৌকো সমেৎ ওরা দুজন । কতনা মাছ ধরেছে । সে এক অন্য নেশা । নৈশ অভিযান ফুরালে ফিরে এসেছে ডাঙায় । মাছ কেটে , বেছে দিচ্ছে অন্য লোকেরা । ডাঙায় ওদের অফিস । তারপর ফিরে এসেছে বাসায় । এগুলি ওদের ব্যাক্তিগত অভিযান । ব্যবসার অঙ্গ নয় । বড়শিতে মাছ গাঁথতে হলে

কী কী পন্থা অবলম্বন করতে হয় সব শিখিয়েছিলো ওকে নিজ হাতে কনোর রিড।

পিয়ানোর রিড নয় হাতে ; সে কোনো এক মরা আলোর সমুদ্র গোধূলিতে বরং মাছের রিব্ । কঙ্কালের শঙ্খ ।

পাঁজরের প্রতিটি কোণায় দধীচীর হাড় দিয়ে বানানো সে এক অন্য শিল্প । বুকের ভেতরে কেমন করে !

ময়ূরধ্বজ মনে মনেও নেই ! প্রেমও বদলায় । সম্পর্ক বদলায় । জীবন বদলায় । কেন্দ্র বদলে যায় ।

আসে নতুন ইন্দ্রধনু । ইন্দ্রজাল বিছিয়ে বদলে দেয় পুরনো সবকিছু । ময়ূরের চিহ্ন কেবল তাহানি ।

যাকে আগে দেখলে বুকটা ছারখার হয়ে যেতো ! ওর প্রকৃত পিতার কথা ভেবে । কিন্তু আজ সমুদ্র মন্থনকালে, ছিন্নবীণা নিয়ে না বসে- মন বসে অন্য অর্গ্যান হাতে নিয়ে ! এই বোধহয় জগতের নিয়ম । **মাইন্ড এক্সহস্টেড্ হয়ে যায় শেষকালে ।** তখন নতুন জেটিতে নোঙর করতে চায় । ইউনিভার্সের এই তো চিরন্তন খেলা । **আজ ব্র্যাডম্যান তো কাল তেন্দুলকর ! আজ শ্রীদেবী তো কাল দীপিকা পাড়ুকোণে !**

কনোরের মৃত্যু, জীবন দুই-ই মাছকে কেন্দ্র করে । বিয়েতেও সেই মাছ মেয়ে । মাছ প্রেমী কেউ !

হার্ট অ্যাটাকের কারণ অসম্ভব স্ট্রেস্ ।

গ্লোবালাইজেশান্ । বিশ্ব সংসারকে মুঠিতে ধরার কল । বিদেশী মাছ কোম্পানি তাদের সুস্বাদু মাছ এদিকে পাচারে ব্যস্ত । কনোরের ছোট , সৎ ব্যবসা বুঝি মাঠে মারা গেলো !

মেয়েকেও মাছ ধরতে শিখিয়েছিলো । মেয়ে খুব কম বয়স থেকেই মাছ ধরতে পটু । বহু প্রাইজ পেয়েছে মাছ ধরার জন্য ; জাতীয় স্তরে । অজাতশত্রু কনোর চেয়েছিলো যে তার ঔরস থেকে জন্ম না নিলেও মেয়ে তাহানি যেন মাছের ভেড়িকেই জীবনের খুঁটি বানায় । **কিন্তু মেয়ে অসম্ভব গুণী হলেও ভীষণ মুডি ।**

মাছের হাত থেকে বাঁচতে হঠাৎ সে নিরামিষাশী হয়ে গেলো । **কনোর বললো : তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুঝলে ?**

তাহানি বলে ওঠে মুখে আজব শব্দ করে : টেক্ ইট্ ইজি ড্যাড ! নো টেনশান ।

কনোর আর হেমার মিলনে কোনো সন্তান হয়নি । কনোরের নাকি স্পার্ম কাউন্ট খুব লো । চিকিৎসক নানান পরামর্শ দিলেও কনোর আর গা করেনি ।

একটি মেয়ে তো আছেই -বাকিটা জুড়ে থাকুক অঢেল মাছ । রঙীন আর ডুরে কাটা ।

ওরা ড্রাই ফিশ্ও তৈরি করতো । হেমার উৎসাহেই। **কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের জন্য আজ বিদেশের সব শুক্নো মাছ , যারা যুগযুগান্ত ধরে এগুলি ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত তাদেরই তৈরি ড্রাই ফিশ লোকে গপগপিয়ে খায় ।** লোকাল ব্র্যান্ডের জিনিস ফেলে । স্বাভাবিক । ওদের দোষ দেওয়া যায়না । কিন্তু এই বিশ্বায়নের ফাঁদে পড়ে কতনা ক্ষুদ্র ব্যবসাদার , যাদের রুটিরুজি ওদের ছোট ছোট ফার্ম --তারা হারিয়ে যাচ্ছে । একের পর এক দোকান উঠে যাচ্ছে । শপিং মলের দাপটে । এখন নতুন সরকার এমনও ভাবছে যে **আর বিদেশী নয় ! হাঁফিয়ে উঠেছে সমাজ গ্লোবালাইজেশানের জন্য !**

মাছের ট্রলারও যেন করুণ চোখে চেয়ে থাকে কনোরের দিকে । অনেকে বলেছিলো যে কোনো বড় ব্র্যান্ডের নাম কিনে নিয়ে ব্যবসা করো ; ওদের হয়ে । কিন্তু কনোর নিজস্বতা বজায় রাখতে চায় । আর মাছ তো কেবল ওর ব্যবসা নয় , মাছ ওর প্রাণ । অন্যের শ্বাস-প্রশ্বাস ধার করে নিজের প্রাণ বাঁচে কি ?

অনেকেই জানেনা যে কনোর রাতের বেলায় বেশ কিছু মাছ নিয়ে জলে ছেড়ে দিতো । বলতো : দিনগত পাপক্ষয় ।

হেমার খুব মজা লাগতো । এতবড় মৎস্য ব্যবসায়ী, যার রুটিরুজি মাছ তার এতবড় দিল্ আর বিবেক একেবারে মাছ সংক্রান্ত ? নাহ্ ! অনেকেই এরকম হলে দুনিয়ায় সমস্ত মানুষ বড়ই সুখে থাকতো । **মেছো, মাছখেকো যে এরকম করতে পারে হেমা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতো না । মেয়েকেও বলতো :: আমার মতন হবার দরকার নেই, বাবার মতন হও । আমার মতন ঘরে না থেকে বাবার মতন স্বনির্ভর হও আর ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করো ।**

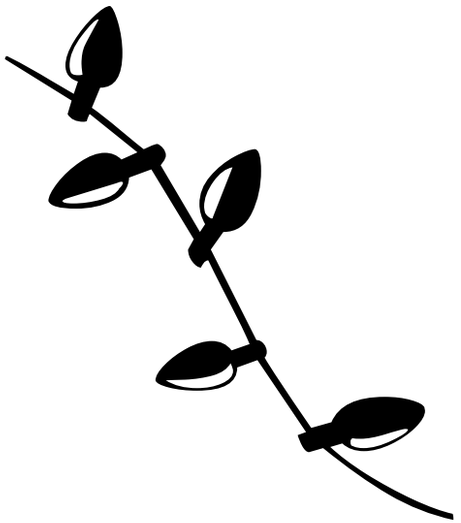

স্বামীর মৃত্যুর পর হেমা, দেনার দায়ে সব বেচে দেয় ।

আর একাকী এতবড় বিজনেস চালানো সহজ নয় ! ও কনোর রিডের স্ত্রী , নিজে মৎস্যবিদ্ কনোর নয় ।

মেয়েও একটি দায় হয়ে উঠেছে । কোনো কাজে মন নেই । খালি পার্টি আর সুরাপান । ড্রাগস্ও নেয় হয়ত । হেমার সিংহলের জীবন আর এখনকার জীবনে কোনো মিল নেই কিন্তু এবার স্বামীহারা জীবন ঠিক কেমন হবে কেউ জানেনা । পয়সাকড়ি ছিলো বলে কিছু বিশেষ অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছিলো । কাজেই খুব একটা নিচে নামতে পারবে না আর ।

এক বড়লোকের বাড়ির বাচ্চাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিলো । গভার্নেস বলা যায় ।

হেমার আদিকূল ইহুদি । শ্রীলংকায় এসেছিলো উদ্বাস্তু হয়ে । আর এই ধনীরা আদতে ইহুদি । তাই কাজটা হয়েই গেলো । নাহলে সাদা চামড়া হয়ত তাকে নিতো না । **শিশুদের সভ্যর বদলে যদি অসভ্য করে তোলে !**

--আমরা সবাই রেসিস্ট , কেউ সামনে কেউবা অন্তরে ।

সবসময় বলতো কনোর রিড !

সিংহলের উপজাতি ছাড়া প্রথম যেসব সভ্যমানুষ ঐ দ্বীপে পা রাখে তাদের মধ্যে কারা নাকি বাংলা থেকে এসেছিলো । তারপরে আসে তামিল মানুষ । পরে আরো অনেক মানুষ এসেছে । যেমন হেমার পূর্বপুরুষ আসে সুদূর দেশ থেকে । হেমার এখন মাতৃভাষা হল সিংহলি । ও একবার একটি তামিল অধ্যুষিত এলাকায় কাজে যায় । সেখানে গিয়ে ওকে তামিল শিখে নিতে হয় বাক্যালাপের জন্য । কাজ মানে ওর স্বামীর ব্যবসার ব্যাপার , অবশ্যই বিয়ের পর পরেই ।

ওদের পরিবারের একজন নাকি প্রাচীন ব্রাহ্মিলিপিতে লেখা সমস্ত কিছু পাঠ করতে সক্ষম ছিলেন । উনি এক গুম্ফাতে এগুলি শেখেন । শ্রীলংকার জাতীয় সঙ্গীত নাকি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন । এসব কিছুই শুনেছে নানান মানুষের কাছে ।

দানব ও যক্ষ, রাক্ষসের দেশ বলে প্রচলিত সিংহল আদতে এক মহামিলন ক্ষেত্র । মানুষের মেলা ।

হাটেবাজারে সব মানুষ । গায়ের রং, ভাষা , খাদ্য, ধর্ম ভিন্ন হলেও এদের উৎসস্থল একটাই ।

মান আর হুঁষের পূর্ণকুম্ভ । অনেকটা কুম্ভমেলার মতন । দক্ষিণী কুম্ভমেলা ।

মাঝে রাবনের মমি পাওয়া গেছে বলে হৈচৈ হল । কিন্তু রাবনকে নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো ।

কাজেই মমির প্রশ্নই নেই ।

কনোরের সান্নিধ্যে হেমা নিজেকে নতুন করে ফিরে পায় । একজন মানুষ যাকে সে ভালোবেসে ছিলো কিন্তু জানতো যে সে তাকে কোনোদিনই চায়নি , তারই সন্তান আজ ওর সম্বল । নিজের বোনের জেদকে মর্যাদা দিতে স্বেচ্ছায় তার ঘর করেছিলো । মেয়ে জানেও না যে সে আসলে কার সন্তান ।

কনোর সেই মেয়েকে বুকে তুলে নিয়েছে , হেমাকে মর্যাদা দিয়েছে । আজ মেয়ে ভুল পথে চলে গেছে । সেটাও কম দু:খের নয় । নিয়মিত কোনো কাজে সে নেই । এত মেধা, ক্ষমতা অথচ কোনো কাজে মন নেই । আজকাল অভাবে পড়ে মাঝেমাঝে টুকটাক কাজ করে ; পয়সা রোজগার করে । ফ্রিতে থাকতে পাবে বলে জেলেও যায় । ঘাস না কেটে । মেয়েটা সংসারও করবে না । নিত্যনতুন বয়ফ্রেন্ড ওর । মেয়ের জন্মরহস্য এরকম বলেই কি সে আজ উল্টোপথে ? কে জানে !

কখনো সে লোকের ভ্রূ-পল্লবে ডিজাইন করে কখনো বা রাস্তায় ক্লাউন সেজে লোককে মজা দেখায় আবার কোনো কোনো সময় গ্রসারি শপে জিনিস বিক্রি করে, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে । কাজের কোনো ঠিক নেই ।

বর্তমান সময়ে সে একটি অদ্ভুত কাজে নিয়োজিত হয়েছে । বিদেশে হারিয়ে যাওয়া অসুখ কুষ্ঠ দেখা দিচ্ছে । এগুলি আসছে সম্ভবত: মাইগ্রেন্টদের মাধ্যমে । এখন এত কেস আসছে যে সরকার একটি হাসপাতাল তৈরি করেছে , দূরে এক নির্জন দ্বীপে । যদিও চিকিৎসকরা বলে যে আজকাল এই অসুখ তেমন ভয়াল নেই আর সবগুলি ছোঁয়াচেও নয় **কিন্তু সমাজে তথ্যের মূল্য খুবই কম ।** আজকাল তো লোকে ফেসবুকে লেখে- নানান কিছু । সেখানেও লোকে এসব নিয়ে খুব আলোচনা করেছে আর ভয় পেয়েছে । সবাই সাংবাদিক । বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর ফেসবুক , কাজেই ।

এই হাসপাতালে কাজের লোক মেলা ভার । তাহানি সেখানে গেছে । ও এখন ওখানে কাজ করছে । খেতে পরতে পাবে । আর অন্যসব শিখে নেবে ।

ও বলে :: আমার মাও তো মাইগ্রেন্ট । এশিয়া থেকে এসেছেন ।

মাইগ্রেন্টদের নিয়ে লোকাল লোকের নানান আপত্তি আছে । অনেকে ওদের তাড়িয়ে দিতে চায় । বলে :: এরা এসেছে বলেই আমাদের সব সমস্যা আরম্ভ হয়েছে । এদের কালচার নিয়ে এসে, এরা আমাদের কালচারকে দূষিত করছে । এরা দলেদলে এসে হাজির হচ্ছে আর আমাদের কমন সিটিজেনদের জন্য অভিশাপ হয়ে উঠছে ।

এদের জন্যই এখানে করাপশান এসেছে । এরা আমাদের ভালোমানুষির সুযোগ নিচ্ছে । এদের তাড়াও !

--গো ব্যাক্ ব্লাডি নিগার । গো ব্যাক্ মুসলিম টেররিস্ট্স্ ! টু রেবেল ইজ জাস্টিফায়েড্ , ফাক্ চাইনিজ গুডস্ ।

আবার উল্টোদিকে মাইগ্রেন্টরা বলে :: আগে তোদের দেশে সব মাঠঘাট ছিলো । আমরা এসে বসতি বানিয়ে এগুলোকে বাসযোগ্য করেছি । এইসব জায়গায় এখন এত স্কুল , কলেজ , হাসপাতাল হচ্ছে । মানুষ বেড়াতে আসছে । তোদের সেনাবাহিনীতে আমরা । উৎসবের সময় আমাদের দিয়ে কাজ করাস্ । আমরা মাইগ্রেন্ট বলেই শিকড় পুঁততে অড আওয়ার্সে কাজ করে যাই । সামাজিক গঠণেও আমরা সাহায্য করি আর এখন আমাদের তোরা ছেঁটে ফেলতে চাস্ ? কত বড় বড় প্রযুক্তিবিদ্, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ভাষাবিদ্--আমাদের দেশগুলি থেকে এসেছে জানিস্ না ?

দুইপক্ষের লড়াই চলেই । হেমার মালিক অর্থাৎ যেখানে সে কাজ করতো সেই মালিক তো রাজনীতিবিদ্ । উচ্চাশা আছে অনেক । সে নাকি সমস্ত পলিসি এমনভাবে তৈরি

করে যাতে এই দেশটার ক্ষতি হয় অচিরেই । **কারণ সেই মাইগ্রেন্ট সমস্যা ।**

ভদ্রলোক এসেছিলো অন্য দেশ থেকে । ওদের পরিবারের অনেকেই হিটলারের ভয়ে এখানে এসেছিলো । ওদের এক পূর্বপুরুষ নাকি গ্যাস চেম্বার থেকে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে ছিলো । সে এইদেশে চলে আসে । আরো অনেকেই আসে । ওরা এইদেশকে সমৃদ্ধ করেছে । শ্রম, সততা আর সাহায্য দিয়ে, জনবহুল করে- কিন্তু এখন অনেকেই ওদের বিরুদ্ধে । মারধোর দেয় । অপমান করে । গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে মিছিল করে ।তাই ভদ্রলোকের পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডা হল এইদেশের ক্ষতি করা । ওর বর্তমান পত্নী এক খেলোয়াড় । আইস হকি খেলেন । ভালই নাম আছে । কাজেই দুজনে খুবই ব্যস্ত । বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য হেমাকে রেখেছিলো । ইহুদি অরিজিন বলেই । নাহলে হয়ত নিয়োগ করতো না ।

হেমা ওদের সাতটি সন্তানকে বুকে করে বড় করেছে । খুবই সম্মান দেয় ওরা । **ন্যানি নয় মায়ের মতনই মনে করে । বলে : মামা ।**

আসলে নাম হেমা তাই ওরা বলে মামা । নিজের মাকে ডাকে মম্ বলে । তার দেখা কদাচ মেলে । হয়ত গোটা বছরে মাত্র দুবার । কয়েকদিনের জন্য ।

বাবা তো যেই দেশের খায়,পরে- সেই দেশকে রসাতলে পাঠাতে প্ল্যান করে । যখন সময় হয় ; হয়ত এক ঝলক নিজের বাচ্চাদের সময় দেয় ।

সাতজনের মধ্যে চারজন এই দম্পতির নিজস্ব । একজন ভদ্রমহিলার আগের পক্ষের । আর অন্য দুজন ওদের পালিত ।

আগের পক্ষের মানে টিনএজের বাচ্চা । মহিলা তখন ১৫। সেইসময় এই শিশু জন্মায় । আগে দাদু ও দিদিমার সাথে থাকতো ।হকি বিশারদ্ বিবাহ করেন এই শর্তে যে ঐ শিশুকে আপন করতে হবে । পতিদেব না করে না । বরং আরো দুজনকে দত্তক নেয় । একজন অ্যাফ্রিকান, অন্যজন থাইল্যান্ডের মানুষ ।

নাম অবশ্য সবারই সাহেবদের মতন ।

এই দেশটার নাম ওলিম । আর রাজনীতিবিদ্ এসেছে গামা দেশ থেকে । হিটলার নাকি গেমোদেরও গ্যাস চেম্বারে দেয় । ইহুদি বলেই ।

এদের মধ্যে তিনজন মেয়ে আর চারজন ছেলে ।

মেয়েরা হল জিনিয়া, তানিয়া আর সোনিয়া ।

ছেলেরা হল পল, বিল, কেন আর বেন ।

সোনিয়া আর বেন পালিত সন্তান আর পল হল হকি প্লেয়ারের টিনএজের বাচ্চা ।

ওদের ; খুব ভালো করেই মানুষ করেছে হেমা ।কেউ বাবা ও মায়ের পেশায় নেই যদিও ।

সাংবাদিক ,সার্জেন,টিচার, কান্ট্রি সিঙ্গার , হিউম্যান রাইটস্ লইয়ার ,আর্কিটেক্ট আর বিজনেস্ ম্যান ।

বিজনেস্ ম্যান আসলে স্পিকারও । নানান কর্পোরেট সমাবেশে গিয়ে মোটিভেশনাল স্পিচ দেয় ।

হেমাকে সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে । নিজ সন্তান তাহানি কেবল নিষ্কর্মা ।

মেধা তো তারও ছিলো । ভালই !

সমুদ্র মন্থনের সময় কনোর, ট্রলারের এক কোণায় বসে বারবার হেমার গল্প শুনতো । ময়ূরকে ভালোবাসা, তার সাথে অভিনেত্রী সেজে রোমান্স আর সন্তান বুকে নিয়ে অন্য অচেনা কাউকে বিয়ে করা । কনোরের খুব অবাক লাগতো । মনে হত হেমা মহিয়সী । নাহলে এরকম করে

নিজের জীবনকে বলি দিতে পারতো না । অন্য কেউ হলে হয়ত হিতার কীর্তি ময়ূরকে জানিয়ে , ওর আসল রূপ বার করে দিয়ে- ওখানেই গেড়ে বসতো। আর ময়ূরের মতন তুখোর বণিক কি গর্ভবতী হেমার সব কথা জানলে, হিতাকে পত্নীর আসনে বসতে দিতো ? মনে হয়না । হিতা তার হিতাকাঙ্খী নয় বরং লোভী । এগুলি নাটকের অবোধ দিক্ । কিন্তু চূড়ান্ত বাস্তব ।

তাই হয়ত মাছের আঁশে-- ঢাকা পড়ে যাওয়া কনোর বার বার হেমার কাহিনী শুনতো, সমুদ্রের নীলাভ আভায়, সূর্যাস্তের লাল মেখে ।

। কনোরের মতন মানুষ বিরল । এরকমই মনে হয় হেমার । মৎস্যই তাদের কাছে এনেছে আবার মাছের কারণেই ওর প্রথমা স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে ।

মানুষটি কেবল মাছ চেনে । মানুষ হয়ত তেমন বোঝেনা ।

তাই হেমাকে মহিয়সী ভাবে, বোকা বলেনা !

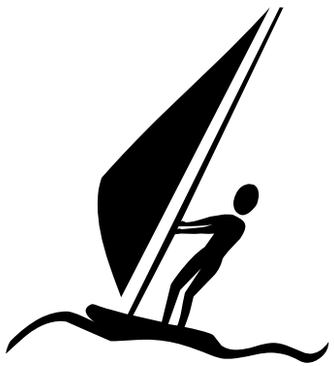

হিতার সাথে আর দেখা হয়নি । ময়ূরধ্বজের সাথেও না । কনোরের কোলে মাথা রেখেই কেটে গেলো এতগুলো বছর । আর মেয়েও ছিলো ।

মেয়ে তাহানি নাকি ঐ হাসপাতালে যোগ দেবার পর এক বয়ফ্রেন্ডকে পাকাপাকিভাবে স্বীকার করেছে । নাকি বিয়েও করবে মাসকয়েকের মধ্যে ।

ওর সাত সন্তানকে বলেছে । সেখান থেকেই জেনেছে হেমা । মায়ের পছন্দ আর অপছন্দের ধার ধারেনা তাহানি । আর প্রেমেরও বয়স নেই । এখন যা হবে তা একান্তই বোঝাপড়া । কাজেই পাত্র যেই হোক্ মেয়ে সুখী হলেই মাও খুশি ।

তবে এই পাত্র একটু আজব। বয়স নাকি ১৫৭ বছর ।

জাতিতে জাপানী । জাপান থেকে এখানে আসে শ্রমিক হয়ে । মালবাহী জাহাজে করে । শৈশব থেকে নাকি মাল বইতো । পরে কিমোনো বানাতো । এখন কিমোনো তৈরির বড় কারখানা আছে । ১৫৭ বছরের এই পুরুষ নাকি একা থাকে আর স্বপাক আহার করে । এখনও । কিমোনো বানালেও সেগুলি জাপানীদের বিক্রি করে । সাহেবদের দেয়না । অন্য জাতির লোক কিনতে পারে ।

কারণ ওর বড্ড বুকে টনটন করে, অ্যাটম বোমার কথা ভেবে । বোমার ঘা কি কিমোনো দিয়ে ঢাকা যায় ?

এই কিমোনো বিশেষজ্ঞ এখন হেমার হবু জামাতা ।

বয়সে হেমা কেন ওর চোদ্দ পুরুষের চেয়ে বড় ।

কী বলে ডাকবে ওকে ? হারাকু ? যা ওর নাম নাকি অন্য কিছু ?

হারাকু নাকি তাহানির ; লেপারদের সেবা করাকে মহার্ঘ্য বস্তু বলে আখ্যা দিয়েছে । যারা মানুষের জন্য কাজ করে একমাত্র তারাই মহান্ , ওর মতে ।

ও নাকি বলে : : জীবনটা নিয়ে আর যাই করো, হিরোসিমা করোনা । কাউকে হায়বাকুশা করো না !!

(WIKIPEDIA --**Hibakusha** is the Japanese word for the surviving victims of the 1945 atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The word literally translates as "explosion-affected people" and is used, often derogatorily, to refer to people who were exposed to radiation from the bombings.)

পল , বিল, তানিয়া -ওরা সবাই হেমার তৈরি পুডিং খেতে ভালোবাসে । ওদের সবার খাবার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ছিলো ।

পালং শাক, লেটুস্, কফি ,ব্রকলি , বিন্স্ , গাজর এগুলি নিয়ম করে খেতে হত । মাংস আর ডিম কম করে খাবার নিয়ম ছিলো । কোলোন ক্যান্সার এড়ানোর জন্য । ফল আর স্যালাড্ একবার খেতেই হবে দিনে ।

ছেলেপুলেরা খুব কাইন্ডলি নিতো না এই কঠোর নিয়ম । কাজেই হেমা, তার মধ্যেই ওদের নানান মুখরোচক বস্তু বানিয়ে খেতে দিতো । স্যালাডের চেয়ে সবজি দিয়ে সুজির হালুয়া ওরা ভালো খেতো । স্যুপের বদলে সম্বর । আর শুধু মাংস না খেয়ে স্বাস্থ্যকর দোসা আর ইডলির সাথে মাংসের হাল্কা কারি । স্ক্রাম্বেল্ড্ এগ দিয়ে

পোঙ্গল- কার্ড দিয়ে দহি বড়া - এইসব । ওরা খুব খেতো । খুশিও হত ।

হেমাকে ওরা খুব ভালোবাসতো ।

ওদের মা একটু ভালগার মহিলা । অনেক সময়ই বাসায় নগ্ন হয়ে ঘুরতো । তার নাকি অসম্ভব গরম লাগছে । এগুলি সামারের সময় হত । আর বন্ধুরা এলে নিজ স্তনের দিকে কিংবা পায়ের জয়নিং এর দিকে ঈশারা করে বলতো : **কী ? তোমরা এগুলোর জন্য এসেছো ?**

একবার তো অতিরিক্ত মদ্যপান করে ; নগ্ন হয়ে- মাঝ রাতে বাচ্চাদের ঘরে চলে আসে । ওদের দেখতে ।

শোবার আগে ওদের কথা মনে হতে- এই অবস্থায় আসা । কী হয়েছে ? এগুলো কার নেই ? সবাই তো জানে এসব তাই না ?

হেমা তখন ওকে বড় তোয়ালে দিয়ে ঢেকে নিজের ঘরে দিয়ে আসে আর বলে আসে যে এত রাতে বাচ্চারা ঘুমায় তো , পরেরদিন স্কুল, কলেজ থাকেই- কাজেই আসার আগে হেমাকে একটি মিসড্ কল দিলেই হেমা বুঝে যাবে যে মিসেস্ আসছেন, তখন বাচ্চাদের তুলে দেবে ।

আসলে মহিলার ড্রেস রেডি করে বাইরে গিয়ে ঢেকে নিয়ে আসবে ।

কিশোর ছেলেরা সব ঘরে থাকে । মাকে এই অবস্থায় দেখা হেমার মতে অনুচিত ।

মদ্যপান না করলে মহিলা একদম ব্যালেন্সড্ । খুবই র‍্যাশনাল । কিন্তু পেটে পড়লেই অন্যমানুষ !

হেমাকেও ওরা খুব ইজ্জৎ দেয় । রাজনীতিবিদ্ , যে দেশের সর্বনাশে ব্যস্ত সেও হেমাকে খুব পছন্দ করে ।

বলে :: তুমি না থাকলে আমার ছেলেপুলেগুলো গোল্লায় যেতো । আমাদের সময় কৈ ওদের দেখার ? যখন সময় হবে ততদিনে ওরা নিজেরাই বাবা, মা হয়ে যাবে !

বলে দিলখোলা হাসি দিতো।

এই একই মানুষ নাকি অ্যাফ্রিকান আখড়ায় যায় । দেশের অকল্যাণ করার নেশায় । এক বুড়ো প্রিস্টকে দিয়ে নানান যাদুটোনা করায় । **জুজু** বলে ওগুলিকে । হেমা শুনেছে অন্য চাকরদের কাছে । খালি গায়ে, এক কালো বৃদ্ধ নানান মন্ত্র পড়ে এসব করে । **নাকি হকিবিদ্ বৌয়ের ওপরেও জুজু মন্ত্রতন্ত্র করে, ওকে কব্জায় রাখতে । ছলনায় জুজুবুড়ি করে রাখে ।**

- ডেস্ট্রয় ওলিম !

এটা নাকি ওর অত্যন্ত কাছের শব্দ আর গভীর মনোবাসনা । তবে সেখানে ভদ্রলোক ছদ্মবেশে যায় । অন্য পুরনো গাড়ি ভাড়া নেয় ; চাকরের নামে । তারপর সেখানে যায় । চারদিকে তো শত্রু তার । পলিটিশিয়ান না ? রাজনীতিতে সব চলে । কাজেই সদা সাবধান !

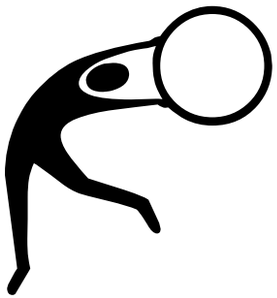

হেমা নাকি সবসময়ই চাইতো যে তার মৃত্যু একবারেই হয়ে যায় । রোগে ভুগে মরার মতন বিলাসিতা করার উপায় নেই তার । কাজেই এমনভাবে মৃত্যু হবে যেন **হট্** করে চলে যায় । কনোরের মতন ।সবাইকে বলতো এইসব ।

সাতজন বড় হয়ে গেলে মনে করে ডিউটি শেষ হয়ে গেছে । রাজনীতিবিদ্ কতটা ক্ষতি করেছে হেমা জানে না তবে বরফে ভেসে বেড়ানো হকি বিশারদ্ এখন খেলা ছেড়ে দিয়েছে । হেমাকে সবসময় পুরো ক্রেডিট দেয় বাচ্চাদের মানুষের মতন মানুষ করার জন্য । তবুও হেমার অন্তরে ফাটল ধরে গেছে । কারণ তাহানি নিজের জীবন নিয়ে

ছিনিমিনি খেলেছে। **এখন তো সে ১৫৭ থেক ১৬২ হওয়া বৃদ্ধ অলিভ গাছের সঙ্গী।**

কী খায় যে এত বছর বেঁচে আছে ? নিরামিষ খায় নাকি ? জাপানীদের মতন কাঁচা মাছ খায়না ? আর নিয়মিত যোগব্যায়াম করে ? কম বয়সে নাকি মালবহন করতো। পরে কিমোনো তৈরির সাথে সাথে মার্শাল আর্টও শিখে নিয়েছিলো।

এর চেয়ে বেশি কিছু জানেনা হেমা তার জামাই সম্পর্কে। আর এত বয়স্ক একজন ; যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে তার জীবনের সব কথা কী জানা সম্ভব নাকি সে নিজেও জানে ?

আগেই বলেছি যে হেমার জীবনে সময় লিনিয়ার নয়। সমস্ত ঘটনা উঠে আসছে এক এক করে।

বয়সের ভারে হেমাও একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তাহানিকে সংবাদ দেওয়া হল। সে সাফ জানালো যে তার বৃদ্ধ পতির সেবা করছে বলে আসা সম্ভব নয়। যে গেছে- সে তো চলেই গেছে। তাহানির আসা না আসার ওপরে আর কিছু নির্ভর করে না কিন্তু যে আছে তাকে দেখা তার কর্তব্য। **তাই এখন সে হারাকুকে নিয়ে ব্যস্ত। কাল একটু সর্দি লেগেছিলো। খুব সাবধানে রাখে। একটু বয়স হয়েছে তো !**

হেমার অন্য সাত সন্তান হাসবে না কাঁদবে বুঝে পায়না।

ওদের বাবা মাও খুবই অবাক। এ কেমন মেয়ে ? মাকে শেষ দেখাও দেখবে না ?

তার উত্তরও আছে তাহানির কাছে।

--সি ওয়াজ আ চিট্। লায়ার। সি ওয়াজ আ কাওয়ার্ড।

নিজের বোনের হাজব্যান্ডের সাথে শুয়ে আমাকে পেয়েছে। সেটা গোপন করেছে আমার কাছে। আমার বাবা, সৎ

আত্মা কনোর রিডের কাছেও নির্ঘাত । আমাকে বড় হবার পরও বলেনি । এরকম মহিলার অন্ত্যো:ষ্টি করার কোন বাসনাই আমার নেই । ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোক্ মৃত কুকুর- বেড়ালের ভ্যানের মধ্যে । অথবা সমুদ্রে ! হাঙর খেয়ে যাবে ওকে । আর সেটাই ও ডিসার্ভ করে ।

সাত সন্তান মিলে, হেমার মৃতদেহটা নিয়ে বাড়ি থেকে কবরখানায় গেছে । সমাধিস্থ করেছে ।

ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছে মামার দেহ ।

খুব কেঁদেছে ওরা সবাই । ওদের মা এমন কি বাবাও ।

হেমাও তো আদতে ইহুদি বংশ জাত- আর মাইগ্রেন্ট !

যথা সম্ভব সম্মানের সাথে ওকে কবর দিয়েছে ওরা । কারণ হেমাও নাকি সেটাই চাইতো । ওর দেহ ধূলিকণায় মিশে যাবে । চিল-শকুনের খাদ্য না হয়ে । ধরিত্রী ; আমাদের দেহ ধার দেয় আর একদিন ফেরৎ নিয়ে নেয় । হয়ত বুঝেছিলো যে মেয়ে আসবে না তাই এই নিয়ে মন্তব্য করে গেছে ! কে জানে ?

হেমা মাইগ্রেন্ট আর অনাথা । কাজেই সবই চলে ।

শেষকৃত্য হয়েছে এই না কত !

বারোয়াড়ি লাশের ঘরে চলে যায়নি । মোমবাতি জ্বলেছে , ছেলেপুলেগুলো অঝোরে কেঁদেছে আবার কি ?

মাইগ্রেন্ট সংস্থা থেকে মোটা ফুলমালা বুকে এঁটে হেমা কফিনে শুয়েছে । আর কি চাই ? নাই বা এলো কেউ - synagogue , rabbiকেউ নেই । শুধু সাত সন্তান ও তাদের **ইহুদি** পরিবার ।

পুপ্পে খরচ না করে ওরা দান করে দেয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণায়। মূলত যেই অসুখে মানুষটি মারা গেছে সেই রিসার্চে অথবা নিতান্তই দান synagogue টিতে!

ওদিকে কিমোনো বিশারদ্ , দুটি বিশ্বযুদ্ধের কবলে পড়া হারাকু এই সংবাদ শুনে তাহানিকে খুব কড়া ভাষায় বকেছে । **বলেছে :: তোমার গর্ভধারিনী ছিলো । তোমার যাওয়া উচিৎ ছিলো । ওঁর কাজের বিচার কেন করছো ? তুমি তখন ছিলে ? কতটা জানো তুমি ? তার চেয়েও বড় কথা ওর জন্যেই তুমি এইজগতের আলো দেখেছো !**

বাবা মায়েরা যেমন সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন সেরকম সন্তানের কাছে তাঁরাও ভালোবাসা চান ।

কিমোনো কর্মীরা হেমার সমাধিতে ফুলের স্তবক দিয়ে গেছে। তবুও তাহানি আসেনি।

গ্লোবালাইজেশানের জন্য প্রাণ হারিয়েছে কনোর।
সেই একই কারণে আবার তাহানি; নিজ জীবন স্বাধীনভাবে কাটাতে সক্ষম হয়েছে- প্রাচ্যের রীতিনীতিকে তোয়াক্কা না করে। আবার সেই বিশ্বায়নই দিয়েছে হেমাকে; তার সাত সুযোগ্য সন্তান। যারা কেবল তার শেষ কাজই করেনি, প্রতি সপ্তাহে- ওর চলে যাবার দিনে সাতটি করে মোম আর ফুলের মালা দিয়ে মনে করে তাকে। এখনও পর্যন্ত একদিনও মিস্ হয়নি। তিন বছর তো পেরিয়ে গেছে!

হারাকু এখনও জীবিত। সে এখন প্রায়ই তাহানিকে খোটা দেয়, মায়ের প্রসঙ্গ তুলে! নিজের মৃত্যুর পর; তাহানি ওকে নিয়ে কী করবে তাও শুধায়। ফিউনেরালে যাবে তো? ওর বিয়ে করা বৌ?

বহুবার নারী ও পুরুষ সঙ্গ করলেও দুজনেরই এটা প্রথম বিয়ে।

তাহানি কেমন বোবা হয়ে গেছে। কথা বলেনা।

মনে মনে অবশ্যই বলে :: কে আগে যায় দেখো!
তোমার যা প্রোফাইল- তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখে গেলেও অবাক হবো না। তবে ওপাড়ে আমি থাকবো তোমায় স্বাগত জানানোর জন্য!

এ ব্যাপারে আমি ১০০ ভাগ নিশ্চিত।

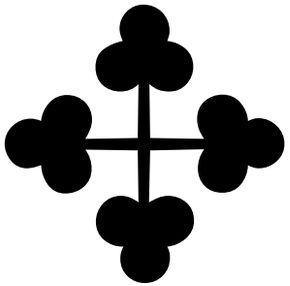

পিশাচ

ঘোস্ট হান্টার মিস্টার অভিরূপ বিশ্বাস , ইন্ডিয়ান প্যারানর্মাল সোসাইটি এবং বিদেশের নানান প্যারানর্মাল চ্যানেলের কল্যাণে আমার অনেক ভূত দেখা ও প্রেতজ্ঞান । এই বই লেখার ব্যাপারে এদের দান- আমি অস্বীকার করতে পারিনা ।

ধন্যবাদ , শুভেচ্ছা আর হ্যাটস্ অফ -সাহসের জন্য ।

তবে বন্ধুরা , সাবধান !

ভূতের মাথায় কখন কী ভূত চাপে ☺

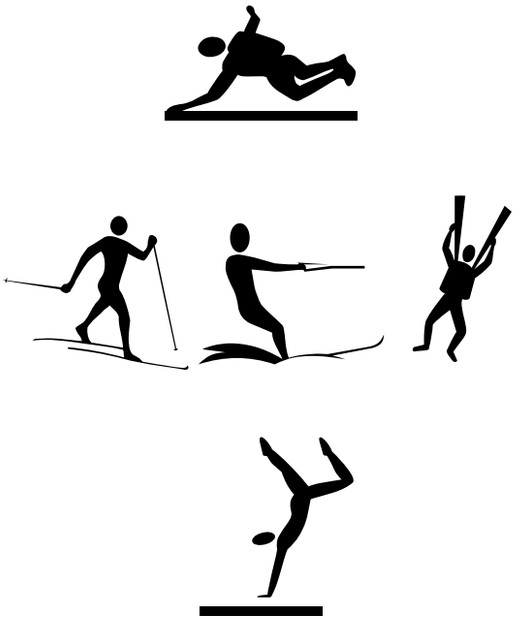

পিশাচ

প্রেতকথা ও মরণমুখী পরব -মহুয়া গান

অরুণাচল প্রদেশের ভালুকপং এলাকায় বেড়ে উঠেছে তিরাপ । ওর বাবা গেগং ; নাগাল্যান্ডে গিয়ে বাসা বাঁধে ।সেখানে ক্রমশ ওরা জাঁকিয়ে বসে । পরে তিরাপ ওখানে নাগা শালের দোকান খুলে বসে । সুন্দর সুন্দর শাল বিকিকিনি হয় সেখানে । নানান উপজাতিদের বোনা হরেক রকম নক্‌শার শাল কিনতে দেশী-বিদেশী মানুষ ওর দোকানে হাজির হয় । উপজাতিদের মধ্যে কে কী ধরণের শাল পরবে সেটা তার মর্যাদার ওপরে নির্ভর করে । এক একটা রং ও নক্‌শা এক এক উপজাতি ব্যবহার করে থাকে ।

মেয়েটি এখন নিজেকে নাগা বলে । যদিও রূপের দিক দিয়ে ভালুকপং ওর মনে একটা বিশেষ স্থান দখল

করে আছে কিন্তু নাগাল্যান্ডেও ও ভালই আছে । এখানে ও কুকুরের মাংস খেয়েছে । লোকে বলে যে কুকুর না খেলে নাকি মানুষের বাচ্চা হওয়া হলনা !

বাড়িতে ওর দুটো বন্ধু কুকুর ছিলো । এখানে ওরা খাবারের প্লেটে । ওদের বাড়িতে ওরা কুকুর খায়নি ।

আসলে ওরা ডিম, মূর্গী , মাছ এসবই বেশি খায় ।

সাধারণতঃ ও অবসর সময় কাটায় গান গেয়ে আর বিভিন্ন ভৌতিক বই পড়ে । অশরীরি সত্ত্বা ওকে ভীষণ আকর্ষণ করে । ও খুবই সাহসী । ওর বোন দ্রু বেশ ভীতু । দুজনে মিলেই দোকান চালায় ।

বিদেশীরা তো আসেই । ওদেরই একজন মাথায় ঢোকায় যে ঘোস্ট হান্টার হয়ে যাও ! নাম তার রায়ান কোহেন । মধ্যবয়সী মানুষ । তিরাপ সদ্য যুবতী ।

রায়ান ভারতে বেড়াতে এসেছিলো । ওর বৌ গ্রেটেল ওদের তিন সন্তানকে নিয়ে চলে গেছে । বাচ্চারা বাবাকে ঘৃণা করে , গ্রেটেলের কারণে । ওদের মা ইচ্ছে করেই রায়ানকে এক মন্দ দানব বলে ঘোষণা করেছে ।

কাজেই বাচ্চারা মায়ের সাইড নিয়েছে । রায়ানকে ওদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি গ্রেটেল । মনের দু:খে নিজের কাজকম্মো ছেড়ে দূরদেশ ভারতে ঘুরতে আসে সে । ওর কাজ ছিলো ট্রেনে , বাইরে থেকে ঠেলে যাত্রীদের কামরাতে ঢোকানো । এই কাজ করতো সে জাপানে । পরে, নিজ দেশে ফিরে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ নেয় । সেখানেই আলাপ গ্রেটেলের সাথে । সে ট্রেন চালিকা ।

রূপসী গ্রেটেল নাকি এক বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে তার সাথে আছে । সে ওদের বাচ্চাদের দেখাশোনা করে । একটি দরিদ্র দেশ থেকে এসেছে । গ্রেটেলের সাথে বিয়ে করার মতলব । হয়ত নাগরিকত্ব সহজে পেয়ে যাবে !

কিন্তু রায়ান ডাইভোর্স করা সত্ত্বেও এখনও কেন গ্রেটেল ওকে বিয়ে করেনি সেটা কেউ জানেনা ।

ওর বয়ফ্রেন্ড ; ওদের সন্তানদের পার্মানেন্ট ন্যানি ।

বাচ্চাদের কথা খুব মনে হয় । ওদের মা যেমন ওদের মানুষ করছে সেরকম কতনা বর্ষণ মুখর সন্ধ্যায় রায়ান ওদের বুকে করে রেখেছে । মাংস বেক করে দিয়েছে ।

কেক বানিয়ে খাইয়েছে । পার্কে নিয়ে গেছে । সাইকেল চালানো শিখিয়েছে । আরো কত কিছু ।

ওদের মুক্ত সমাজে তো ওরা স্কুল থেকেই সম্ভোগে ডুবে যায় । কাজেই নানান কোণে ওদের সন্তান থাকে । কিন্তু রায়ানের মোট এই তিনখানা বাচ্চাই আছে । মাঝে মাঝে মনে হয় যে দু একটি এদিকে সেদিকে থাকলে মন্দ হতনা এখন । অন্ততঃ ওদের কচি মুখগুলো দেখা যেতো । শান্তি পেতো এই টালমাটাল সময়ে ।

বন্ধুত্ব হতে দেরি লাগেনি । তিরাপ খুব মিষ্টি মেয়ে । রায়ান ও তিরাপের জুটি ওদের বাবা , মা ও বোন দ্রুর ভালই লেগেছে । কাজেই এক শুভ সন্ধ্যায় ওরা গীর্জায় গিয়ে বিয়ে সেরে ফেলেছে ।

বিয়ের পর রায়ান কিছুদিন নাগা প্রদেশে ছিলো ।

পরে দেশে ফিরে যায় । সেখানে বছরখানেক কাজ করে । আজকাল মোবাইল আর নেটের যুগে দুনিয়া তো হাতের মুঠোয় ! কাজেই সদ্য বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও দূর দেশে , একাকী নয় নববধূ -- বরং ওর সাথে রোজই কথা বলতো । লাইভ ছবি দেখতো । ক্ষুধাতৃষ্ণা যেন ভুলে যেতো ।

বেশ কিছুকাল কাজ করে , টাকা জমিয়ে ফিরে আসে ভারতে । এবার ওরা দুজনে পুণায় গিয়ে একটি প্যারানর্মাল সংস্থা খুলে বসে । তিরাপের শালের ব্যবসা দেখাশোনা করে ওর বোন দ্রু । বাবা ও মায়ের বয়স হয়েছে । ওরা নিয়ম করে বিভিন্ন নাগা উৎসবে যোগদান করে । ওর মায়ের অনেক নাগা ও কুকি বন্ধু আছে । মা বলে : আমরা ভালুকপং থেকে এসেছি কিন্তু আমাদের বড় মেয়ে নাগা ।

নাগা সংস্কৃতি খুব ভালোলাগে তিরাপের ।

প্রথম ভৌতিক অভিজ্ঞতা ভালুকপং অঞ্চলেই ।

অরণ্যের গাছ কেটে, কাঠ নিয়ে আসে মেয়েরা । জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে । সেই কাঠের টুকরো বয়ে আনার ঝুড়িগুলো এক বুড়ি তৈরি করতো । তার বাস বনের কাছেই । একমাত্র ছেলে ট্রেকের সময় লোকজনকে গাইড করতো । কোনো বন্য পশুর পেটে যায় সে একদিন ।

তারপর থেকে বুড়ি একটু পাগল পাগল ভাব দেখায় ।

একা একা বিড়বিড় করতো । ঝুড়ি তৈরির ফাঁকে ফাঁকে । সেই বুড়িটা একদিন ঝড়ের কোপে পড়ে মারা যায় । বনের ধারে ওর বাসাখানি ভেঙে পড়ে ।

চাপা পড়ে যায় । তারপর থেকে ট্রেকাররা এবং অন্যান্য মানুষ ওকে নিয়মিত দেখতো । দেখা যেতো এককামরার বাসাখানি দিব্যি দাঁড়িয়ে । ভেতরে বসে বসে, বুড়ি ঝুড়ি নির্মাণে ব্যস্ত অথবা কাঠের চুল্‌হায় রান্না করছে । অনেকে ভয় পেয়ে যেতো । কিন্তু তিরাপ একদিন সোজা বাসায় প্রবেশ করে । বুড়ি ওকে জানায় যে তার খুব কষ্ট । এইভাবে মারা গেছে বলে ।

তখন তিরাপ ও তার পরিবার সেই বুড়ির অন্তিম কাজ করে ফেলে । ধর্মের নিয়ম মেনে ।

সেই থেকে বুড়িকে আর কেউ দেখেনি ।

এই ঘটনার পরে তিরাপের মনে হয়েছে যে মৃত মানুষ জীবিতদের সাথে যোগস্থাপণ করতে সক্ষম ।

ভূত নিয়ে ওর উৎসাহ ছিলই , বরাবর । এবার জোরকদমে নেমে পড়ে রহস্যময় এই জগতের সন্ধানে ।

তারপর রায়ানের সাথে আলাপ, পরিণয় আর ভূত সংস্থার শিলান্যাস !

পুণায় অনেক ভৌতিক স্থান আছে । শনিওয়ার-ওড়া একটি বিশেষ প্রেত-স্থান । সিংহগড় দূর্গেও দেখা মেলে । আরো অনেক আছে । লোনাভালায় একটি

হন্টেড হোটেল আছে । রাজ কিরণ হোটেল । সেখানে নাকি কিছু ঘরে ; শুয়ে থাকলে ভৌতিক জিনিস টের পাওয়া যায় । অনেকে ঈষৎ উন্মাদ হয়ে বেরিয়েছে ওখান থেকে । এইসব দেখেশুনে তিরাপ ও রায়ান কোহেন ঘাঁটি গেড়েছে পুণায় ।

সংস্থার নাম ডাস্ক । সোজা ভাষায় গোধূলি ।

এই সময় তেনারা ঘুম থেকে উঠে বসেন ।

শুরু হয় প্যারানর্মাল কান্ড কারখানা । মিডিয়াম ও সাইকিকদের মহার্ঘ্য কাল এই গোধূলি । অনেক সাইকিক অ্যাটাকও হয় এই ক্ষণে । অর্থাৎ অন্যভুবন থেকে এসে মিডিয়ামদের আক্রমণ করে ।

রায়ান মজা করে বলে : এইসব ভূতেরা অ্যামেরিকান । কারণ ভারতে যখন সবাই ঘুমায় তখন ওরা কাজে নামে ।

রায়ান ভারতে এসে, হর্ণবিল উৎসব দেখতে যায় উত্তরপূর্ব ভারতে । যাকে বলা হয় 'Festival of Festivals'.

লোক সংস্কৃতির এই মহোৎসব খুবই ভালোলাগে তার ।

তবে একটি আজব ভৌতিক ব্রিজের দেখা পায় ।

এই এলাকায় একটি বড় ব্রিজ আছে সেখানে নাকি রাতে সব প্রেতেরা ঘোরে । কেউ হুশ্ করে উড়ে যায় সাইকেলে । কেউ ব্রিজের নিচে জলে বসে থাকে । কেউ আশেপাশে ঘোরে যদি ব্রিজে মানুষ দেখে । কেউবা শিস্ দিয়ে চলে যায় । ওরা পাশে এলে শরীর ভারী হয়ে যায় । গা ছমছম করে ওঠে ।

দিনের বেলায় ব্রিজ একদম স্বাভাবিক । লোকাল মানুষ এই ঘটনা নিয়ে সোচ্চার হয়না । টুরিস্টদের আসা বন্ধ হবে তাতে । এছাড়া এখানে একটি মুন্ডুহীন শিশু ঘুরে বেড়ায় এবং লোকের পাশে এসে- তাকে তারই হাঁড়ির খবর দিতে শুরু করে । এমন এমন জিনিস বলে যা বহিরজগতের কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয় ।

কে চাকরাণীকে অন্ত:সত্ত্বা করেছে ,কে ঘুষ দিয়ে ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে , কে টয়লেটে বসে কী করে এইসব ।

একজনকে বলেছে : তোমার সেবার অপারেশান হলনা ? তখন ওরা পেট কেটে কী একটা বার করলো । গ্যাল গ্যাল করে রক্ত বার হচ্ছিলো । তারপর জানো তো সেই জিনিসটা পেটে না ঢুকিয়েই সেলাই করে দিলো ।

সত্যি তো ! পথিক ভাবে , আমার তো পেটে এরকম একটা সার্জারি হয়েছে । সেখানে একটি রোগাক্রান্ত অর্গ্যান কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে !

শিশুটি কে কেউ জানে না । রায়ান অনেক খবর নিয়ে বার করতে পেরেছে যে এই ছেলেটি বিশেষ ক্ষমতাধারী ছিলো । কিন্তু ওর মা ওকে জন্মের আগেই অ্যাবর্ট করে দেয় তা ওর বয়স তখন প্রায় গর্ভে -আট মাস । মা ছিলো ফেমিনিস্ট আর বাই-সেক্সুয়াল । ওর বাবা একা মায়ের দৈহিক ক্ষুধা মেটাতে সক্ষম ছিলো না । মায়ের একজন পুরুষের সাথে একজন নারীও লাগতো ।

এক গার্লফ্রেন্ড জুটে গেলে ওর বাবাকে ত্যাগ করে । তখন ও ওর মায়ের গর্ভে । ওকে ছেঁটে ফেলে দেয় । পেটে খুব জোরে আঘাত করায় বাচ্চার মাথায় চোট

লেগে মারা যায় । পেট কেটে শিশুকে বার করতে হয় । মা অবশ্য ভাগ্য জোরে বেঁচে ওঠে । ঐ দেশে এইধরণের পৈশাচিক আচরণ আইন সম্মত হওয়ায় মায়ের জেল হয়না । দেশের প্রেসিডেন্ট একজন ফেমিনিস্ট । কাজেই সন্তান যেকোনো সময়ই মেয়েরা অ্যাবর্ট করাতে সক্ষম বলেই উনি মনে করেন । তাই আইনও নিরুপায় ।

কিন্তু এই শিশুটি এইদেশে কেন ?

আসলে স্পিরিটরা তো সময় ও স্থানকে ভেদ করে যেতে পারে । হয়ত তাই ।

আবার অন্য স্থানে গোয়েন্দা ভূতের দেখা মিলেছে ।

তার সম্বল একটি জাদু পেন্সিল । সেই পেন্সিল দিয়ে লেখা শুরু করলেই মানুষের সমস্ত অপরাধের ডাইরি লেখা হয়ে যায় নিজে থেকে । গোয়েন্দা এই কারণে এলাকায় প্রসিদ্ধ । নিছক হিংসার বশে একদিন খুন হয় এক সহকর্মীর হাতে । তবে সেটা নাকি পেন্সিল বলে দিয়েছিলো । তাই গোয়েন্দা বাবু শেষ অঙ্কে বলতো : আরে আমি কোথায় যাবো ? কোথায় যেতে পারি ?

এখানেই ছিলাম , আছি আর থাকবো ।

তার কথাই সত্য । আজও দেখা দেয় গোয়েন্দা । আর

এইসব ঘটনাই ওদের আরো ঠেলে দেয় প্যারানর্ম্যালের দিকে ।

তিরাপ তো কতনা আজব কান্ডের সাক্ষী ।

প্রেত শব্দটা কৈশোর থেকেই আকর্ষণ করে । মানুষ মরে কোথায় যায় ? এত প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ সমস্ত শেষ হয়ে যায় মোমশিখা দপ্ করে নিভে যাবার মত ? কেন লোকেরা আদি অনন্তকাল থেকে ভূতের দেখা পায় ? সবাই মিথ্যেবাদী এমন কি বলা যায় ?

হোয়াইট হাউজে আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেতাত্মা দেখেছেন স্বয়ং চার্চিল এবং অনেক বড় নেতা যাদের বিশ্ব জোড়া নাম ! সবাই ভুল দেখেছেন ?

কাজেই এরকম প্রেত গবেষকের কাজ পেয়ে মহা আনন্দে আছে তিরাপ । সাহসী কিন্তু মিষ্টি মেয়ে ।

ও তো নিজে অনেক ভয়াল স্থানে ঘুরেছে !

সেই যে সেই অট্টালিকা যা এখন হোটেল , সেখানে রাতের বেলায় আবাসিকদের কারো কারো ঘরে দেখা যায় এক ন্যুড মেয়ে । সে ক্লান্ত পথিককে তার বেডরুমে সিডিউস্ করছে । তারপর যদি সেই মেয়ের সাথে শোও তাহলেই তুমি খতম্ । মেয়েটি অপরূপা ।

আসলে সে নাকি ছিলো এই অঞ্চলের উড-বি রাণী মানে যুবরাণী । তাকে তার শ্বশুর মহাশয় ; শিরচ্ছেদ করে শাস্তি দেন পরকিয়ার জন্য । এই অট্টালিকা এক পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ । এখন হোটেলে পরিণত করেছে সরকার ।

আবার সমুদ্রনীলের কিনারায় কারা যেন আলোর নৌকোতে ভেসে বেড়ায় । হেল্প হেল্প করে চীৎকার করে । বাঁচাতে গেলেই চোরাবালিতে ডুবে প্রাণ যায় ।

কিংবা রহস্যময় বান্টি । এক গ্রামের ধারে তাকে প্রায়ই দেখা যায় একটি জ্বলন্ত গাড়িতে বসে চীৎকার করছে !

কাছে গেলে কিছু দেখা যায়না । পুলিশ এখন ওদিকে যেতে বারণ করে, সন্ধ্যার পরে । কারণ অনেক চালক পথভ্রষ্ট হয়েছে ।

আবার সজনেডিহির তসলিমা ।

সে হঠাৎ করে পথের মাঝে এসে দাঁড়ায় । তাকে দেখলেই মৃত্যু । কারণ পেছনের সীটে এসে বসে জাঁকিয়ে । ততক্ষণাৎ গাড়িটি কন্ট্রোল হারায় আর ধাক্কা দেয় পাশের মহীরুহতে ।

শোভার মায়ের গল্পও অনবদ্য । মিস্টার পালের হোটেল আছে হিমালয়ে । সেখানে রাতে দেখা যায়

শোভার মা ঘুরছে । কোনো গেস্ট যদি তাকে ফলো করে তাহলে পৌঁছায় গিয়ে একদম ওপরতলার একটি বড় ঘরে । সেখানে ঢুকলেই দরজা নিজে থেকে বন্ধ হয় । তারপর চারিদিকে লেলিহান আগুনের শিখা ।

ধোঁয়া আর দমবন্ধ করা গ্যাস । মানুষ পালিয়ে আসার চেষ্টা করলেও মারা যায় । আসলে ভদ্রমহিলা এই ঘরে ঐভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন । সেই স্পর্শ দেন গেস্টদের- যারা ওর পিছু ধাওয়া করে ।

এগুলি সব তিরাপ ও রায়ানের কাছে সত্য । জীবন্ত । কেবল ভূতের গল্প নয় ।

শ্মশানে প্রেত দেখেছে । দেখেছে কবরখানায় । নিজ মুন্ডু হাতে নিয়ে ঘুরছে কেউ । কেউবা সাহায্য চাইছে নিজ মৃত্যু রহস্য ভেদ করার জন্য ।

এগুলি দেখে দেখে তিরাপ এখন একদম সিওর যে মরণের পরে আমাদের অস্তিত্ব থাকে । আমরা ওখান থেকেই আসি আবার চলে যাই । কেন আসি তাও জানে । হয়ত বাসনা আর কর্মের যুগলবন্দী !

বহু ভৌতিক জায়গায় ওরা আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেছে । তাপমাত্রা কেন কমে যাচ্ছে , কেন হাড় হিম হয়ে যাচ্ছে অথবা ভাইব্রেশানে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা । নানান জায়গায় যদিও এগুলির তারতম্য দেখা গেছে কিংবা বিশেষ ক্যামেরায় অশরীরির ছবি উঠেছে কিন্তু প্রেতেরা ছায়ামানুষ হয়েই থেকে গেছে । তাদের হাতের মুঠোয় ধরা যায়নি ।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ওকে এসে প্রেতেরা নানান সংবাদ দিয়েছে অথবা ওদের জন্য পুজোপাঠ করে, ওদেরকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করেছে ।

তিরাপ সেগুলো করেছে । ওরা বলেছে : **আমরা যেটার ভেতরে ছিলাম সেটা তো নেই কিন্তু বায়বীয় সত্ত্বা রয়ে গেছে ।** তারই শান্তি কামনায় এই আবদার নিয়ে এসেছে তাদের কাছে যারা এখনও ওটার ভেতরে (খোলস) আছে । মানে দেহ ।

তিরাপের যেন ধীরে ধীরে মনে হতে থাকে যে ও এইসব প্রেতেদেরই একজন । স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গ আর তেমন ভালোলাগেনা । নিঝুমবকম্ পাহাড়ের শিখরে উঠলে যে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়

সেখানেও ওরা গেছে । তিরাপ ভেবেছে যে আত্মহত্যা করবে । ওকে এক আর্মি অফিসার বাঁচান ।

ঐ পাহাড়ে আগে পাহাড়িদের কবর দেওয়া হত । এখন ওখানে সুন্দর বাগিচা । কফিনগুলো পাহাড়ের গায়ে ঝুলতো অনেকটা বাস্কেটের মতন । সেগুলি খুলে এখন ওখানে বাগান ফেঁদেছে লোকাল নেতারা ।

কিন্তু এই আজব শিখরে উঠলে আজও লোকের মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছে হয় ।

ক্রমাগত মনে হয় : মরবো তো একদিন বটেই তাহলে আজকেই নয় কেন ?

ওখানে প্রেতেরা যেন তিরাপকে বলেছে : এসো , কাছে এসো । দেখো এদিকেও আছে জীবন ! মরণের পরেই শেষ নয় বিচ্ছুরণ !

রায়ান অবশ্যি বলেছে যে ওর সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো উচিৎ । হয়ত ডিপ্রেশানে ধরেছে । নাহলে কেন হঠাৎ এইরকম আত্মহত্যার ইচ্ছে হবে ?

রায়ান এগুলো করে , প্রেতের গবেষক ; কিন্তু মনে প্রাণে হয়ত বিশ্বাস করেনা । নিছক কৌতুহল আরকি !

ও কিন্তু তিরাপের মতন প্রেতেদের একজন হয়নি আজও । প্রেতেরা ওকে নিজেদের কষ্ট বোঝায় না ।

তিরাপের যেমন কয়েকবার দেহে অসম্ভব জ্বালা দেখা গেছে । চিকিৎসক কোনো কিছু ধরতে পারেনি ।

পরে জানতে পেরেছে যে আগের দিন একটি হন্টেড বাড়িতে গিয়েছিলো, সেখানকার বাড়িওয়ালি প্রচন্ড যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেছেন কর্কট রোগে ।

সেই জ্বালাই যেন তীব্র বেগে ধেয়ে আসে তিরাপের দেহে । আবার এক লরি ড্রাইভার একটি সুড়ঙ্গে ; এক বৃদ্ধাকে একা দেখে লিফট্ দেয় । সুড়ঙ্গ শেষ হলে দেখে পাশের সিটে কেউ নেই । পরে জানা যায় যে আরো অনেক লরি ড্রাইভার এই বৃদ্ধাকে দেখেছে ।

তখন সেই প্রথম ড্রাইভার একটি পদ্য লেখে এই ঘটনা নিয়ে । আসলে ঐ ড্রাইভার বি-এ পাশ করে লরি চালক হয়েছিলো । পেটের দায়ে ।

সেই লরি চালকের সাথে যোগাযোগ করে তিরাপ ও রায়ান ঐ পথে ভ্রমণ করে । যথারীতি সেই বৃদ্ধার দেখা মেলে । ড্রাইভারের পাশের দুটি সীটেই লোক বসে আছে দেখে বুড়ি বলে ওঠে : আমি পেছনে মালপত্রের ওপরে উঠে বসে চলে যাবো ।

এত বয়স্ক একজন সুড়ুৎ করে উঠে বসে লরির ওপরে । কোনো সিঁড়ি ছাড়াই ! তারপর রায়ান না বুঝলেও , তিরাপের গায়ে কেউ যেন বেতের বাড়ি দিতে থাকে ।

বুড়ি যখন অদৃশ্য হয় তখন চাবুক থেমে যায় । আলোতে এসে দেখা যায় যে সারাদেহে দাগ হয়ে গেছে তার ।

কাজেই তিরাপের মনে হয় যে ও আসলে একটু একটু করে অলৌকিক জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে !

তা নাহলে রায়ান যা বোঝে না ও সেগুলো বুঝে যায় কী করে ?

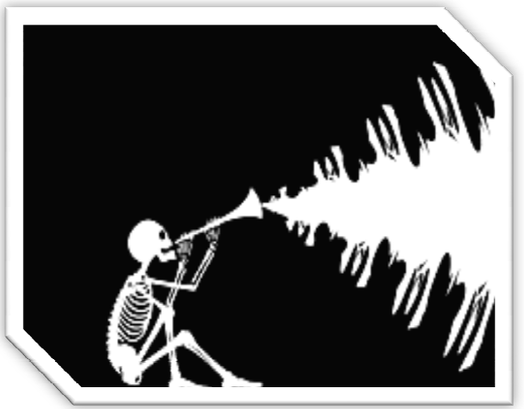

আসলে শরীর চলে গেলেও অভিজ্ঞতা গুলো থেকে যায় । সুক্ষ্ম পর্যায়ে । কেউ এগিয়ে যায় প্রেতলোকে কেউবা একই এক্সপেরিয়েন্স বারবার রিপিট করতে থাকে এই দুনিয়াতে বসে ।

কেউ মিডিয়ামদের সন্ধানে থাকে । পেলেই নিজের শোক দু:খ জানাতে চায় । কায়াহীনের কান্না ধরা দেয় মিডিয়ামের স্বরে ।

রায়ানের এক মৃত আত্মীয় ; যে পুরুষ , তার কন্ঠস্বর বার হয়েছে তিরাপের গলা দিয়ে । তিরাপ মিডিয়াম নয় । কিন্তু তবুও ও বায়বীয় দেহের স্পর্শ পায় ।

গন্ধ পায় । স্বাদ পায় । অতীন্দ্রিয় পত্রিকায় ও নিয়মিত লেখে । পশু প্রেতের কথাও লেখে । সারমেয় যেমন বহু ক্ষেত্রেই মালিকের সাথেই থাকে । দেহ গেলেও !

উপকারও করে তারা । পাহারাও দেয় ।

এরকম অনেক নজির আছে । আর আশ্চর্য হল যে লোকে ওর কথা খুব বিশ্বাস করে । অন্যদের এমনকি রায়ানের কথাও অনেক সময় লোকে মানে না ।

ভাবে গল্প বলছে । কিন্তু তিরাপের কথা যেন প্রেত চেতনার নিজ মুখ থেকে শোনা উপাখ্যান !

হয়ত এইজন্যই আজকাল তিরাপের মনে হয় যে ও দেহযুক্ত হলেও আসলে প্রেতলোকের বাসিন্দা ।

সবসময় তাই যেন একা থাকে । বিড়বিড় করে ।

স্বামীকে সঙ্গ দেয়না । সেক্স লাইফ জিরোতে ।

কোনো এনজয়মেন্ট নেই । আনন্দ লহরী নেই ওর মনে । যেন কোনো ই-টিকে এনে বন্দিনী করে রেখেছে কেউ । মাছের ডাঙায় ওঠার মতন ব্যাপার । কেবল খাবি খাচ্ছে , অপেক্ষা করে আছে দমবন্ধ হয়ে আসার ।

রায়ান এই পরিবতর্ন লক্ষ্য করেই ওকে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বলে ।

কিন্তু তিরাপ জানে যে ও উন্মাদ নয় । সুস্থ । শুধু ও এই জগতের আর কেউ নয় ।

ভালুকপং, নাগাল্যান্ড আর তেমন ভালোলাগে না।

মন্দ লাগে পুণার দূর্বার দূর্গগুলি। মস্তানি মহলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আগুনে ঝাঁপ দিতে মন চায়।

স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ। কোনো লুকানো মৃত্যুবাণ নয়!

নিজের ইচ্ছেয় চলে যাওয়া ওপাড়ে। যেখানে আছে অন্য মাধুর্য্য। অন্যভুবনের হাতছানি।

ওদের নগর ওদের মতন। আমাদের মতন কেঠো নয় কাঠবাড়ি। জগৎ রহস্যময় হলেও তিরাপের মনে হয় যে আআলোক ওর কাছে বাস্তব ও জীবন্ত। ওখানে কোনো রহস্য নেই। যা কিছু লুকোচুরি তা এখানেই।

এখানেই ঈর্ষা, রাগ, লোভ। ওদিকটা স্বচ্ছ আর অবিনশ্বর। ওরা থাকে ওধারে কিন্তু ওদের মন আয়নার মতন। ওরা কুটিল নয়। নাহলে অপরিচিত মানুষকে নিজের জীবনখাতা খুলে; পড়ে শোনায় কেউ ??

অনেক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে তিরাপ ও রায়ান কোহেন । কিন্তু প্রেতআরা কেবল তিরাপকেই নিজেদের ভেবেছে । রায়ানকে নয় । ওকে কয়েকবার ওরা আক্রমণ করেছে । মেরে ফেলার জন্য ।

ফাইনাইট , ইনফাইনাইটকে ভয় পায় কাজেই রায়ান একটু দমেও গেছে তবুও তিরাপের মোহের কারণে এই কাজ বন্ধ করতে পারেনি ।

একটি মেন্টাল অ্যাসাইলামে ওরা গিয়েছিলো কিছু বছর আগে । সেখানে অমাবস্যা রাতে আক্রান্ত হয় রায়ান ।

পরিত্যক্ত এই দালান চত্বরে কোথা থেকে যেন টপ্‌টপ্‌ করে তাজা রক্ত এসে পড়তে থাকে । পুরো বাগান ও উঠোন লালে লাল । তিরাপ মজা করে বলে ওঠে : কমিউনিস্ট ভূত গো !

রায়ান বলে : আরে না না, ভূতেদের মধ্যেও উঁচু নিচু আছে । যেমন মামদো ভূত , পিশাচ , ডাকিনী , গো ভূত !

হ্যাঁ-- একবার একটি কুকুর ভূতের দেখা পেয়েছিলো ওরা । পশুরা তো গুছিয়ে কথা বলতে জানেনা কাজেই ওরা কোনক্রমে কমিউনিকেট করে ফেলে । যেমন ঐ সারমেয় বলে : আমি ওদিকে হ্যাঁ যাবো !

কিংবা : আমি এগুলি না খাবো ! আমি মাংস হ্যাঁ খেতে চাই ।

আবার কোনো জিনিস জানে কিনা জিজ্ঞেস করলে বলতো : আমি সেটা না হ্যাঁ জানি ।

অর্থাৎ হ্যাঁ জানি ব্যাপারটা না মানে নেগেটিভ ।

আর সেখানে ও সেটায় গোলমাল করে ফেলতো কুকুর প্রেত । সে একটি ইস্কুলে ছিলো । তার মণিবের মেয়ে রেলগাড়ি চাপা পড়ে নিহত হয় । মেয়েটি নিয়মিত ইস্কুলে হানা দেয় । সেখানে মেঘলা দিনে ও অমানিশায় বহু মানুষ ওকে দেখেছে স্কুলের পোশাকে ।

হাতে একটি চেন আর তাতে ঐ সারমেয় যুক্ত । সারমেয়টি শোকে দেহ রাখে । অভুক্ত থেকে থেকে ।

তার আগে রোজ, নিয়ম করে বিকেলে স্টেশানে গিয়ে অপেক্ষা করতো মেয়েটির জন্য । স্টেশান বাড়ির কাছেই ছিলো ।

মেয়েটি ওকে খুব ভালোবাসতো । পাগানিনি নামে ডাকতো । মালকিন শোকে দেহ রাখা পাগানিনি ও মালকিন রক্তিমা মালহোত্রা এই বিদ্যালয় চত্বরে ঘুরে বেড়ায় । কারো ক্ষতি করেনা । তবে কেউ চিটিং করলে মাথায় চাটি খায় অদৃশ্য হাতের ।

আরেক কলেজে একবার এক দিদিমণি খুন হন ।

লাশ থেকে চুইয়ে পড়ে রক্ত । সেই রক্তে ভেসে যায় কলেজ বাড়ি । খুনের কারণ নেই কিন্তু । এক বহু পুরাতন কর্মী , প্রায় বৃদ্ধ -একদিন এসে মহিলাকে মাথায় লোহার রড মেরে খুন করে নেতিয়ে পড়ে । খুনের কোনই মোটিভ নেই । লোকটি আপাতঃ দৃষ্টিতে নিরীহ । সহজ সরল মানুষ ছিলো ।

পরে জানা যায় যে ঐ কলেজ প্রাঙ্গনে কিছু লোক , গাঢ় সন্ধ্যায় নানান তন্ত্র মন্ত্র করতো ।

সেই গুহ্য বিদ্যা , নষ্ট হাতে পড়ে হয়ে ওঠে ভয়াল ।

ডার্ক স্পিরিট এসে লোকের ওপরে ভড় করে ।

তারপর মোটিভ বিহীণ খুন খারাপি হতে আরম্ভ করে ।

বুড়ো কর্মী যেহেতু নেতিয়ে পড়ে তাই বুঝি তদন্ত শুরু হয় অন্য অ্যাঙ্গেলে । তাকে সাইকো বলাও যায়না । ট্র্যাক রেকর্ড খুবই ভালো । কাজে কাজেই ।

প্রেত কেবল সাধারণ নয় , ডার্ক অর্থাৎ নেগেটিভও হয় । তারাই পিশাচ , ডাকিনী ইত্যাদি ।

লোকের ক্ষতি করাই ওদের উদ্দেশ্য । অনেক প্রেত এলাকায় ওরা সক্রিয় । ওদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় । ওরা অসম্ভব ভয়ানক । দেহের রক্ত শুষে নেয় , মানুষ রক্তহীন হয়ে মারা যায় । তিরাপের মনে হয় এই যে ইদানিং এত যুবক ও কিশোর নেহাৎ-ই খেলার ছলে বিভিন্ন প্রেত গহ্বরে গিয়ে ঘোস্ট হান্টিং করছে তারা অজান্তে ভয়ানক বিপদের মুখে পড়ে যাচ্ছে ।

কেউ কেউ তো মারাও গেছে । তবুও ইনফাইনাইটের রহস্যভেদ করার নেশায় ছুটে চলেছে অনেক টাট্‌কা প্রাণ , ফলাফলের ভয়াবহতার কথা না ভেবেই ।

একটি মেয়েকে গুন্ডারা ধর্ষণ করে । তারপর সে আত্মহত্যা করে । যেই বাগানে ধর্ষিত হয় মেয়েটি তার পাশে সরু পথ । হরেক রকম পুষ্পের মেলা সেই

বাগানে । কেউ ভুল করে যদি রাতে ওখানে যায় তাহলে চাঁদ শিখায় দেখা যায় যে একটি যুবতীকে কারা রেপ করছে । মেয়েটি চীৎকার করছে । লোকে ওকে বাঁচাতে যায় । কিন্তু কাছে গেলে আর কিছুই দেখা যায়না । শুধু কোথা থেকে গায়ে ও হাতে এসে পড়ে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ।

যে নেগেটিভ ইমোশান্স্ নিয়ে সে এই দুনিয়া ছেড়ে গেছে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে নিজের দু:খ লাঘব করার চেষ্টা করছে । জায়গাটি আসামের দিকে । তাই তিরাপ করলো কি, কামাখ্যা থেকে তান্ত্রিক এনে ওখানে পুজো করায় । মেয়েটি মুক্তি পেয়ে যায় । আর এই দৃশ্য দেখা যায়নি । **যোনি খুন হওয়া মেয়েটি প্রেতযোনিতে হয়ত এখন সুখেই আছে !**

শুধু মানুষের শোকতাপ আছে আর কারো নেই এরকম তো নয় । কায়াহীনদের কষ্ট আরো বেশি । কারণ ওদের কাহিনী শোনার মতন উদার ও মায়াবী মন খুব কম মানবসন্তানেরই থাকে । যা আমাদের সবার ভবিষ্যৎ তাকে আমরা প্রতি মূহুর্তেই অস্বীকার করি ।

আমরা সবাই প্রেত হবো আর প্রেতযোনিতে যাবো এই চরম সত্যের মুখোমুখি হতে আমরা ভয় পাই ।

আমাদের ঢাল হল আমাদের অতি ক্ষুদ্র ইগো ।

যাকে ফুলিয়ে, ফাঁপিয়ে নিয়ে আমরা নিজেদের সব্বজান্তা ও অমর ভেবে বসি ।

তিরাপের কাছে এসে ওরা কাঁদে, মনোবেদনা জানায় । তাই বুঝি তিরাপের মনে হয় যে ও আদতে প্রেতলোকের বাসিন্দা কিন্তু সময়ের বুননে এখানে আছে ।

স্পিরিটদের টাইম সেন্স নেই । হয়ত ওদের দুনিয়াতে ; সেই প্যারানর্মাল ডায়মেনশানে, বায়োলজিক্যাল ক্লক খুবই আস্তে চলে ! কে জানে ?

তিরাপের সন্ধ্যাগুলো অবসন্ন । অবসাদে ভরা ।

ঘোস্ট হান্টিং করতে যায় কিন্তু মনে হয় আর ফিরবে না । ওদের জগতে চলে যাবে । আর ওদের যেহেতু দেহ নেই তাই রোগ-ব্যাধি নেই । ওদের দুনিয়াতে নোংরা আর আবর্জনা নেই । নেই পোকামাকড় । ওদের , আমাদের মতন রোজ খাবার কথা চিন্তা করতে হয়না । ওরা মনে মনে খেতে পারে ।

যেহেতু ওরা চিন্তাজগতের বাসিন্দা তাই শুধু চিন্তা করেই ওরা পেট ভরাতে পারে । **ইট জাস্ট হ্যাপেন্স্।**

ওদের শরীরের নানান নাম থাকলেও তিরাপের ভালোলাগে **কারণ শরীর** নামখানি । শুধু একটি কারণে এই দেহ, বজায় রাখে স্পিরিট । তাহল ডিজায়ার । বিভিন্ন ইচ্ছে । বাসনা । কামনা ।

তাই হয়ত কারণ শরীর নাম ।

অনেক গ্রামীণ প্রেতালয়ে তো গেছে তিরাপ । সেখানে শুনেছে **শবর মন্ত্রের** কথা । সাধু গোরক্ষনাথ এই মন্ত্র উদ্ধার করে মানব সভ্যতাকে প্রদান করেন । এই মন্ত্র যে কেউ, যে কোনো অবস্থাতে জপ করতে সক্ষম ।

মন্ত্রগুলি এতই পোটেন্ট যে ইন্সট্যান্ট ফল পাওয়া যায় । গ্রামের অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষ এইসব জপ করে নানান বিপদ আপদের হাত থেকে রক্ষা পায় ।

অনেক সময় পিশাচ ও ডাকিনীবিদ্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় ।

একটি বিশেষ মন্ত্র আছে যা ওর কাজে লেগেছিলো রায়ান কোহেনকে পিশাচের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য।

Om hrim srim gom, Hum phat svaha—

মন্ত্রটা আরো বড় । ও শুধু একটি লাইন বলতেই রায়ানের দেহ ছেড়ে পালায় ডার্ক স্পিরিট ।

তার আগে ভূতুড়ে ঐ পরিত্যক্ত কারখানাতে, যেখানে ৫০০ শ্রমিককে পুড়িয়ে মারে ওদের শয়তান, বত্তমিজ্ মালিক --ফ্যাক্টরিতে কম্পিউটার বসানোর জন্য সেখানে রায়ান সবার সামনে মানে ঘোস্ট ট্যুরের কর্মীদের সামনে, মাটিতে শুয়ে কুকুরের মতন মুখ দিয়ে শব্দ করছিলো ও চার পায়ে হাঁটার চেষ্টা করছিলো । সমানে লালা নি:সরণ হচ্ছিলো যা কিনা মেঝে স্পর্শ করতেই হয়ে যাচ্ছিলো লাল তাজা রক্ত কণিকা । সেই সময় এই শবর মন্ত্র দিয়েই জীবন

ফিরিয়ে দেয় নিজ স্বামীর , তিরাপ । নেশায় ও পেশায় প্রেত গবেষক !

শুনলে অবাক হতে হয় যে এই মন্ত্রও ওকে কেউ ওর পেছনে দাঁড়িয়ে , ঘাড়ে নি:শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে দেয় !

----Om hrim srim gom, Hum phat svaha--

এইভাবে ক্রমশ প্রেতেদের একজন হয়ে ওঠা তিরাপ আর পারেনা প্রেমাস্পদদের ছেড়ে থাকতে ।

শেষদিকে সে একা একা বসে কাদের সাথে যেন কথা বলতো । তাদের অবয়ব দেখা গেলেও পা থাকতো মাটির ওপরে । ওরা ভাসমান সত্ত্বা । কেউ মানুষকে ভেদ করে চলে যেতো । কেউ কাছে এলেই মনে হত হঠাৎ সাইবেরিয়ায় পৌঁছে গেছি ।

কেউ আসতো মানবী সেজে । সামনে এসে মুখটা দেখালেই দেখা যেতো যে একটি সম্পূর্ণ মুখে অনেক গর্ত । চোখ ও নাক বিশেষ করে । ঠোঁটদুটি কমলালেবুর কোয়ার মতন ঈষৎ লালাভ ।

সাধারণ মানুষ এইসব দেখলেও তিরাপের কাছে ওরা একান্ত আপনজন । ওদের ছেড়ে ও আর থাকার কথা ভাবতে পারেনা । ও আর এই দুনিয়ার কেউ নয় ।

মানুষ দেখলেই গা গুলিয়ে ওঠে । ভেতরে জবরজং সমস্ত অর্গ্যান আছে ভেবে । টয়লেটে যায় মানুষ ।

সেক্স করে । এগুলি খুবই দূষিত বস্তু । ও জৈব হতে চায়না আর । অজৈবই ওকে আকর্ষণ করে ।

ভাবে আত্মহত্যা করবে । যখন প্রেতজগতে যায় অ্যাস্ট্রাল ট্রাভেল করে , ধ্যানের মাধ্যমে তখন ওখানেই থেকে যেতে চায় । যেই সুক্ষ্ম রূপার তার বা সিলভার কর্ড দিয়ে পার্থিব শরীরের সাথে যুক্ত থাকে তাকে ছিন্ন করে ফেলতে চায় চিরতরে । কিন্তু প্রেতেরা বাধা দেয় । বলে : স্বাভাবিক নিয়মে আসাই ভালো ।

কিন্তু সে আরো কতকাল ? মৃত্যু তো কারো হাতে নয় ! বিধাতাই সেটা ঠিক করেন ।

রায়ানের সঙ্গ অসহ্য লাগে । ও নিয়মিত টয়লেটে যায় । সেক্স করতে চায় ! যত্তসব ন্যাস্টি জিনিস ।

মহুয়ার নেশায় মত্ত মানুষের মতন সবসময় কেমন ঝিমিয়ে থাকে আজকাল তিরাপ ।

কেউ কেউ বলে যে ওকে ভূতে ধরেছে । কিন্তু ও মনে প্রাণে ভূত হয়ে যেতেই চায় । শুধু নর্মাল ডেথ যদি আসতো এখন । আচ্ছা, কত লোক তো আছে যারা মরতে চায়না কিন্তু মরে যায় । আর ও মনেপ্রাণে মরতেই চায় । কিন্তু মারা যাচ্ছেনা । কেন প্রকৃতির এই অবিচার ?

ওর প্রাণটা ও স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে চায় । কেন যমরাজ নিচ্ছেন না ? যমদূত নাকি অ্যাসহোল ওরা ?

কবে যমরাজের সুমতি হবে কেউ জানে ?

ভারতে অনেক উপজাতির মধ্যে একটি আজব প্রথা আছে । সেটা হল কোনো মেয়ে যদি কুশ্রী হয় তাহলে মনে করা হয় যে তাকে প্রেত, স্পর্শ করেছে । অর্থাৎ সোজা ভাষায় ভূতে ধরেছে । যদি কোনো রূপসী নিজ ইচ্ছায় এক গহীন বনে গিয়ে নিজেকে প্রেতছায়ার কাছে সমর্পণ করে তাহলে কুৎসিত মেয়েটি মুক্তি পায় । আর রূপবতীকে প্রেত, কব্জায় নিয়ে নেয় । তবে তাকেও ওরকম ভূতের মতন দেখতে হয়ে যায় কিনা সেটা কেউ দেখেনি কারণ সেই সুন্দরী আর জীবিত থাকেনা । মানে লজিক হল কুশ্রীকে নিয়ে এখানেই থাকো আর সুন্দরী পেলে তাকে নিয়ে পগার পার হয়ে যাও !

সুন্দরী বৌ বাসায় থাকলে, বাড়িতে ঢিল পড়ার ভয়ে অনেকে সাধারণ মেয়েদের বিয়ে করেন কিন্তু ভূতের তো আর সেইসব সমস্যা নেই । ভূত ঢিল খায়না , ঢিল মারে । কয়েক ঘা দিয়ে দেবে- বেশি বিরক্ত করলে ।

যেমন একবার তিরাপের খুব শরীর ভারী হয়ে যায় এক ভূতুড়ে ঘরে গিয়ে । ও প্রেতকে জিজ্ঞেস করে ওঠে : তুমি কোথায় ? এখানে এসে বসেছো নাকি ?

প্রেত বলে ওঠে : আমি এক ছোট কুকুর । আমি তোমার পাশ দিয়ে তখন যাচ্ছিলাম । আমি **না** বসেছিলাম ।

অনেক স্পিরিট মানুষের থট্ প্রসেসে থাবা বসায় । তখনই বলে যে স্পিরিট পসেজ্ করেছে । অনেক সময় একের বেশি আত্মা পসেজ্ করে । মানুষের পার্সোন্যালিটি বদলে যায় ।

প্যারানর্মাল । অকাল্ট । গুহ্যবিদ্যা । সুপার ন্যাচারাল । মেটাফিজিক্যাল । যাই বলো ।

ওদিকে ভয় আছে , রহস্য আছে , ভন্ডামি আছে আর আছে পদে পদে বিপদ । কিন্তু একে অস্বীকার করার আর উপায় নেই তিরাপ ও রায়ান কোহেনের ।

ছোট ছোট দল তৈরি করে যারা ভূত দর্শনে যায় নিছক অ্যাডভেঞ্চারের লোভে, তাদের খুব ডিস্কারেজ করে এখন রায়ান ।

বলে : **যা পর্দায় ঢাকা তা ঢাকা থাকাই ভালো ।ঢাকারও একটা সৌন্দর্য্য আছে ।**

সায়েন্স যেমন তেজস্ক্রিয়তা এনেছে । এখন তার মাশুল দিচ্ছে মানব সমাজ ; সেরকম প্রেতকূল পরশের মাশুল দিচ্ছে রায়ান কোহেন নিজে । **পত্নীকে, পেত্নীতে রূপান্তরিত হতে দেখে ।**

রহস্য থাক্ । মিস্ট্রি আছে বলেই জগৎ মধুময় ।

সব খুল্লম্ খুল্লা হয়ে গেলে ভালোলাগবে ?

ভালোলাগবে প্রমাণ পেলে যে এখন যেই দুনিয়াতে সব রস , রঙ শোষণ করছো তাকেই মৃত্যুর পরে ডেস্ট্রয় করে দিতে হবে চূড়ান্ত ভাবে ?

রূঢ় প্রেত-সত্য নাই বা জানা গেলো । মায়া ও ছায়া জগতে কেন পা বাড়ানো ? দেহ থাকতে ?

এই জগৎই কি যথেষ্ট নয় এই জীবনের জন্য ? কন্নড় ভাষায় বলা যায় (রায়ান সম্প্রতি শিখেছে) : :

তুম্বা এনজয় মাডি ! (এনজয় করো)

সময় মতন সবাই এসে গেছে । একটি পাহাড়ের উপত্যকায় মাত্র পঞ্চাশটি ঘর নিয়ে ক্ষুদ্র জনপদ। একটি ছোট প্যাগোডা আকারের উপাসনা গৃহ । বহু গৃহপালিত পশু । চমরি গাই ও মেষকূল । সেখানেই আজ তিরাপের আত্মসমর্পণ । প্রেতের হাতে ।

সন্ধ্যা হতেই আকাশে রূপার চাক্তির মতন নিষ্পাপ শশী । শশী বৃদ্ধ । শিশু নয় । একইরকম তিরাপ । পূর্ণ বয়স্ক যুবতী । নিজেকে উজার করে দিতে চলেছে প্রেতপুরুষের কাছে । পতিকে পাশ কাটিয়ে । অবহেলা করে । যেন ঐ ছায়াময় জগতেই আছে লুকানো চাবি । আনন্দ নগরের ।

খুব সাজিয়েছে আজ তিরাপকে । এই অঞ্চলের মানুষ । বিশেষ করে কদাকার ঐ মেয়েটির বাড়ির মানুষ ।

মেয়েটি আজ নিস্তার পাবে আত্মার হাত থেকে । সুন্দর একটি কোমল জীবনের স্পর্শ পাবে সে । আর তিরাপ

তো মহীয়সী । নাহলে কেউ এইভাবে **নিজ স্বামী** ছেড়ে প্রেতের হাতে নিজের রূপযৌবন ঢেলে দেয় ?

তিরাপে মূর্তি বসবে এখানে । একটি রডোডেন্ড্রন বৃক্ষের নিচে সেই স্ট্যাচু বসবে । এই চওড়া পাহাড়ি পথের নাম হবে তিরাপ পুই ।

কারণ গত ২০০ বছরের মধ্যে এই এক রূপবতী নিজেকে মানবসমাজের কল্যাণে সমর্পণ করতে চলেছে প্রেতাআর হাতে । এই নারী বিদূষী হলেও আবেগ প্রবণ , কোমল । লৌহ মানবী নয় আধুনিকাদের মতন । ইত্যাদি ।

নগ্ন নারী । নগ্ন প্রকৃতি । কমলের মতন কোমল দেহলতা, একদা প্রেত গবেষক তিরাপ কোহেনের । স্বামীর পৌরুষকে অবহেলা করে যে ধাবিত হচ্ছে অচিন দেশে, অশেষ কৌতুহল নিয়ে আর পরম শান্তিতে ।

যা ফেলে যাচ্ছে এদিকে তাই নিয়ে কোনো দু:খ নেই তার শুধু যেখানে চলে যাচ্ছে সেখানকার মূর্চ্ছনাই শুনতে পাছে অদেখা রুদ্রবীণার ঝঙ্কারে । হয়ত বাজছে কোনো মধুকলি কিংবা হংস্বধনি ; কে জানে !

অনেক দূরে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে একটি কদাকার মেয়ে । হলুদ মেয়ের মুখটা লেপা পোঁছা । মাথাটা বিরাট বড় । দেহ তুলনায় সরু । পেট মোটা আর পশ্চাৎদেশ সুবিশাল । ঠিক যেন দুদিকে দুটি ঘটম্ বসানো ।

দুটি অদৃশ্য হাত দিয়ে যেন প্রেতকূল এতদিন ধরে সেই ঘটম্ -এ সঙ্গত করতো ।

----তা না না দ্রিম দ্রিম , তোকে দেখে মানুষের হবে হাড় হিম ! তা না না দ্রিম দ্রিম ।।

গহীন বনে ঢুকে গেছে তিরাপ । নগ্ন হয়েই । এই নিয়ম । নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দী আমরা । আজ তিরাপ হতে চলেছে শৃঙ্খল মুক্ত । তাই সে ভীষণ খুশী ।

নগ্নতা দিয়েই তো আরম্ভ জীবন- তাই নগ্নতায় শেষ বাঁশি । পর্ণগ্রাফি নয় পর্ণমোচী বৃক্ষের মতন । খসে পড়ে পাতা , বল্কল । চেতনার মোটা ছাল ।

আর রায়ান থেকে থেকে ডুবে যাচ্ছে এক অচেনা, অজানা অন্ধকার গহ্বরে-- যার শুরুটা দেখতে পেলেও শেষটা আজ অবধি কেউ দেখেনি !

বিষ খেয়েছে রায়ান । ওষুধের ওভারডোজ ।

মাছরাঙা

The more refined one is, the more unhappy…..
Anton Chekhov

মাছরাঙা

গল্পটা কোন দেশের সেটা না বলে কার গল্প সেটা বলাই বেশি ভালো । দেশটি ভারতের কাছেই , মিথ-ভূমি । আর এই উপাখ্যান এক দরিদ্র গ্রাম্য মেয়ের । নাম তার বিজলী । বিজলী সাহা ।

গ্রামীণ মেঠোপথে সাইকেল চালিয়ে সে বেড়ে উঠেছে । বাবা দরিদ্র কারবারি । মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান চালায় আর একটা ছোট টায়ারের দোকানে কিছু ব্যবসা করে । ওদের পূর্বপুরুষেরা অধিকাংশই ; সরকারের আজব নীতির জন্য, যুবক বয়সে বিদেশে --ক্রীতদাস হিসেবে যেতে বাধ্য হয়েছে । সেখানে লগ অর্থাৎ কাঠ চেরাই এর কাজে নিয়োজিত হয়েছে । কোনোদিনই

তারা ফেরেনি । পালাবার চেষ্টা যারা করেছে তাদের মেরে ফেলা হয়েছে এবং দেশে তাদের পরিবারের ওপরে অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়েছে । এই দেশে একটাই সরকার । পাঁচবছর অন্তর ভোট হয় । কিন্তু লোকের কাছে একটিই চয়েস থাকে । কারণ একটিমাত্র লোক কিংবা তার পুত্র ভোটে দাঁড়ায় । ২০১৬ সালেও এই ব্যাভিচার চলেছে । লোকের চুলের ছাঁট , পোশাক এমনকি বিয়ের ব্যাপারেও সরকার হস্তক্ষেপ করে ।

মানুষ মুষড়ে থাকে । কিন্তু কোথায় যাবে দেশ ছেড়ে ?

দরিদ্র এই ব্যবসাদারের একটিমাত্র মেয়ে বিজলী আর চার-পুত্র । মেয়েই বড় । ছেলেরা লেখাপড়া করে । স্কুল-কলেজে । ব্যবসা বাড়ানোর ইচ্ছেতে দুই ছেলে বি-কম পড়ে । অন্য দুটি স্কুলে পড়ে । মাথা ভালো । তবে কবে সরকার বাহাদুর ওদের চলান করে দেবে কাঠের কাজে সেটা কেউ জানেনা । ভাগ্য ভালো থাকলে অন্য কেউ যাবে । ওদের পরিবার থেকে এই যাত্রায় বা জেনেরেশানে কাউকে নেওয়া হবেনা ।

শুধু মেয়েটি চায়ের দোকানে কাজ করে । রুটি সবজি বানায় । চা ও জলখাবার হিসেবে । আসলে এই

এলাকায় প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তাকে কুকুরের সাথে বিয়ে দেওয়া হয় ।

যাতে বংশে আর কখনও প্রথমে মেয়ে না হয় ।

মেয়েরা দূর্বল, অসহায় আর নির্বোধ । কাজেই কেউই চায়না যে তার ঘরে মেয়ে জন্মাক । দুনিয়ার সমস্ত মেয়ের জন্ম বন্ধ হয়ে গেলে বংশ বাড়বে কী প্রকারে সেই নিয়ে অবশ্যি কেউ মাথা ঘামায় না ।

ঘরে প্রথমে মেয়ে এলে, সেই মেয়েকে কুকুরের সাথে বিয়ে দিলে আর কারো প্রথম সন্তান মেয়ে হয়না ।

ব্যাপারটা অন্ধ বিশ্বাস বলা যায়না কারণ মেয়ে জন্মানো একেবারে প্রথমে ; বন্ধ হয়েই যায় ।

সরকারও এই প্রথায় সায় দিয়েছে কারণ যত যুবক সমাজে, তত ক্রীতদাস পাঠানো যাবে আর অর্থও আসবে অনেক--বিদেশ থেকে। বিদেশী মুদ্রা, মোহর ।

এরকমই এক ঘরে তো জন্মেছে বিজলী ! কাজেই প্রথম কন্যাসন্তান হিসেবে তাকে সারমেয় প্রিয়া করা হয়েছে । লোকে বলে- আজকাল কুকুরই পতিরূপে বেশি আদৃত । কারণ কুকুর মালিককে মানে বৌকে চিট্ করে না । অন্যের সাথে স্ত্রীর অজান্তে প্রেম বা সহবাস করেনা,

ঠকায় না , পরকিয়া করে করে । কাজেই কুকুর স্বামী একটি লোভনীয় চয়েস্ । মন্দের ভালো ।

বিজলী অবশ্য সেরকম মনে করেনা । কিন্তু তার কোনো উপায় নেই । এই অঞ্চলের অনেক মানুষ অর্থাৎ মমতাময় পেরেন্টরা- মেয়ের বিয়েটা আগে অবশ্যই রাধামাধবের সাথে গোপনে সেরে ফেলে ।

কারণ ওদের বিশ্বাস যে এরকম অপয়া মেয়েকে সারাটা জীবন শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করতে পারবেন সমাজ ও দুর্ভাগ্যের হাত থেকে । কাজেই ঝুলন পূর্ণিমার দিন গোপনে ওরা মেয়ের বিয়ে দেন কৃষ্ণের সাথে । একেবারে কনেটি সাজিয়ে । তারপর দিনক্ষণ ও পাঁজি দেখে কুকুরের গলায় বরমাল্য দেয় মেয়েটি ।

এখানেই শেষ নয় । সারমেয়টি, নববধূকে চুম্বন এর বদলে শুঁকে দেখে ; তার গাত্রে কিঞ্চিৎ মুত্রত্যাগ করে ফেলে । অর্থাৎ নিজ এলাকা চিনে নেয় । তখনই বিয়ে সম্পূর্ণ হয় । যদি কুকুর, স্ত্রীর গায়ে মুত্রত্যাগ করে এরিয়া মার্ক না করে তার অর্থ হল এই যে সে ঐ মেয়েকে পত্নীরূপে বরণ করেনি । তখন ভিন্ন কুকুরের

সন্ধান করে মানুষ । পর পর তিনটি কুকুর যদি স্ত্রীর মর্যাদা না দেয় তখন মেয়েটিকে গ্রামছাড়া করা হয় ।

তার ঠাঁই হয় কোনো বেশ্যাগৃহে অথবা কোনো কামুকের লুকানো গুহায় ।

মদনমোহনের সঙ্গে বিয়ে দেবার ওটাও আর একটি কারণ । যদি আগে কৃষ্ণের বৌ হয়ে যায় তাহলে নাকি কুকুর মুত্রত্যাগ করেই ফেলে ; কাজেই পিতৃগৃহেই কুকুর সমেৎ মেয়েটি জীবন কাটায় ।

বিজলীকে ওর ভাইরা মজা করে বলতো : দিদি তুই এবার থেকে ভৌ-রব প্র্যাকটিশ্ কর । ভৌ-উ-উ-উ !

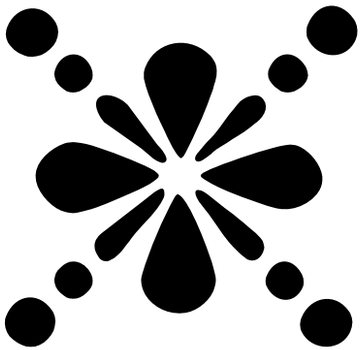

বিজলী অবশ্যি লেখাপড়া করতে খুবই ভালোবাসে । ওকে ওর দরিদ্র বাবা কিছু পড়িয়েছে ।

লাইব্রেরী থেকে পুরনো বই ধার করে আনে । খুব পড়ে । সমস্ত বই পড়ে ফেলে । সবরকমের বই পড়ে ।

লাইব্রেরিয়ান খুব দয়ালু । বলেন : বই মানুষকে জ্ঞান প্রদান করে । বই হল ঈশ্বর । কাজেই কেউ পড়তে চাইলে তাকে আমি না বলতে পারবো না ।

কাজেই মেম্বারশিপের ফিজ্ না দিলেও বই নিয়মিত পেতো বিজলী । খুব পড়তো ।

টায়ারের শুল্ক দোকানের এককোণায়, একটি লন্ঠন নিয়ে বসে- শীতের রাতে উষ্ণ চায়ের পেয়ালা হাতে পড়তো । বাবারা অনেক রাতে দোকান বন্ধ করতো । পাশেই হাইওয়ে । কাজেই অনেক মানুষ আসতো রাতে । বিশেষ করে অনেক দূরপাল্লার বাস ও ট্রাক্ ।

অনেক সময় ট্রাকে করে অস্ত্র-শস্ত্র চালান হতেও দেখেছে ওরা । ত্রিপলের নিচে সাজানো মরণাস্ত্র !

কত যাত্রীবাহী বাসের মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে । অনেক বন্ধুও হয়েছে । তাদের কাছ থেকে কতনা অজানা জিনিস জানতে পারে ।কত দেশের খবর পায় !

এইভাবেই ধীরে ধীরে আলাপ হয় এক লরি ড্রাইভারের সাথে । তার নাম কুমুদ । কুমুদ কুম্বলে ।

সে দক্ষিণী । ঘোর কৃষ্ণবর্ণ । কুতকুতে চোখ । আর বেশ গাট্টাগোট্টা । তামিল , কন্নড় , তেলুগু সব জানে । একবার বলছিলো : **সেঢ়ি, পোঢ়া, ইচ্ছানু , ছিঃঅসত্বে । পোঙ্গাড়া । আন্না। চিন্না ।**

বিন্দু বিসর্গ মানে না বুঝলেও বিজলী এরপর থেকে ওকে দেখলেই এগুলি আওড়াতোঃ **সেঢ়ি পোঢ়া ইচ্ছানু, ছিঃ অসত্বে। পোঙ্গাড়া । আন্না চিন্না !**

দুজনেই হেসে উঠতো । লোকটি এখান থেকে প্রায় অর্ধমাতাল হয়ে ফিরতো । বিজলী ভাবতো ::: অ্যাক্সিডেন্ট না হয় !

ওর ভাইরা বলতো :: তোর অত কি ? বুড়ো ব্যাটা নিজের ভালো না বুঝলে কে কী করবে ? আর আমরা বিজনেস করছি । যে শালা পয়সা দেবে, তাকেই মাল বেচবো !

লোকটির জন্য বিজলীর একটা কোমল দিক ছিলো । কেন সে জানে না ।

কুমুদ, মাসে দুবার কি তিনবার আসতো । ওর বাড়ি মাদুরাইয়ের দিকে এক গ্রামে । বাবা চাষী ।

কুমুদ বলতো যে কিছু টাকা জমিয়ে ও কাজটা ছেড়ে দেবে । গ্রামে একটা হোটেল খুলবে ।

এইভাবেই গল্প করতে করতে একদিন বিজলী ওর সাথে পালিয়ে যায় । তবে স্বামীকে ছাড়েনি ।

কুকুরটিকে সঙ্গে করেই নিয়ে যায় । কুমুদও আপত্তি করেনি ।

শহরে গিয়ে বিজলী কাজ নেয় । সেই লাইব্রেরিতে । বই-টই সাজানো । এগিয়ে দেওয়া এইসব । মাইনে যা পেতো ওর চলে যেতো । ওর স্বামীকে অর্থাৎ ঐ সারমেয়টিকে ভাড়া দিয়েছিলো । এক নিঃসঙ্গ দম্পতি ওকে নিয়ে যায় । মাসে মাসে টাকা দিতো তার জন্য । ও গিয়ে স্বামীকে দেখে আসতো মাসে একবার ।

ওর বরের নাম নবাব । নবাব এখন ঐ দম্পতির সাথে থাকে । অর্থাৎ ও কিছু রোজগার করে । আর কুমুদ লরি চালানো ছেড়ে একটি ছোট হোটেল খুলেছে গ্রাম আর শহরের মাঝে । হাইওয়ের ধারে । ওরা থাকে গ্রামেই । কুমুদের বাসায় । ওর বাবা ও মায়ের সাথে । কিন্তু কাজ করতে বিজলী যায় শহরে । সাইকেল চেপে । কুকুরটিও শহরেই আছে । নবাবী চালে হাঁটে আজকাল , নবাবজাদা !

কুমুদের সাথে কিন্তু বিজলীর বিয়ে হয়নি ।

মাঝবয়সী এই মানুষটিকে ও **বন্ধু ও দাদা বলে** ।

কুমুদও ওকে স্নেহ করে । আর বোনটি এত বই পড়তে পায় এখানে সেটা দেখে যারপরনাই আহ্লাদিত । এরকম বইপাগল মেয়ে সে দেখেনি । **বইয়ের পোকা যাকে বলে !** তাই বুঝি হেসে বলে : তুই উঁইপোকা না, তুই হলি বইপোকা ।

আসলে কুমুদ সামান্য লেখাপড়া জানে । আর এই সহোদরা একেবারে **এ বি সি ডি** নয় এই মোট্টা মোট্টা বই পড়তে সক্ষম ।

কুকুরের সাথে সহবাস হয়নি বলেই বোধহয় বিজলী সাহা এখনও কুমারী আছে ; যাকে বলা হয় :: টেকনিক্যালি ভার্জিন !

কুমুদের মনে হয় যে বিজলীর আরো পড়া উচিৎ । যে এত বই ভালোবাসে তার আরো শিক্ষা বাড়ানো উচিৎ । কয়েকবার বলেছে । মেয়েটি বলে :: দাঁড়াও ! আগে কিছু টাকাপয়সা করি তারপর ।

এইভাবেই প্রাইভেটে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে । তারপর হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স ।

এতদিনে কুমুদের হোটেলে খুব রমরমা । দারুণ চলছে ব্যবসা । ইডলি , দোসা, উত্তাপাম, কার্ড রাইস , পোঙ্গল আর ভড়া-সম্বর দূর্দান্ত চলছে ।

হাইওয়ের ধারে আরো দোকান আছে । কিন্তু ওর দোকানে এত লাইন হয় যে সেই লাইন রাস্তায় উঠে যায় । আজকাল ও ভোরে দোকান খোলে আর মধ্যরাতে বন্ধ করে ।

সময়মতন প্রাইভেটে হায়ার সেকেন্ডারি ও পরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাশ করে বিজলী । কিছু টাকা লোন নেয় । কিছুটা দেয় পাতানো দাদা , কুমুদ কুম্বলে । এইভাবে শিক্ষা সমাপ্ত করে সে কাজ নেয় একটি মাঝারি হোটেলে । বছর কয়েক ভালো কাজ করে । অভিজ্ঞতা হয় । তারপর সে চলে যায় অন্য শহরে ; একটি নামজাদা পুরানো হোটেলে ।

আগে এটি ছিলো এক কেল্লা । সেখানে মহা যোদ্ধারা বাস করতো । এখন এটি এক হোটেল । খুবই সুন্দর । বর্ণনাতীত । কিন্তু এখানে একটি সমস্যা আছে ।

এখানে আআ আছে । অর্থাৎ এই হোটেল চালাতে হলে, সেই আআর পারমিশন নিয়ে সমস্ত কাজ করতে হয় । ঢুকতেই একটি বড় পোর্ট্রেট । সেই যোদ্ধার ।

রাজতিলক, পাগড়ি আর ডাকুদের মতন গোঁফ ।

তিনিই মালিক । আজও । অলিখিত । হয়ত বা অবাঞ্ছিতও । কে জানে !

কেউ যদি প্রথম কাজে লাগে, তাকে গিয়ে ঐ পোর্ট্রেটের সামনে সেলাম ঠুকতে হয় । তারপর সেদিন রাতে নিজ ক্যামেরায় ছবি তুলতে হয় । যদি ছবি ওঠে তার অর্থ হল এই যে সেই কর্মীকে উনি গ্রহণ করেছেন একজন হোটেল কর্মচারি হিসেবে । যদি ফটো না ওঠে, তা সে যত ক্ষমতাশীল ফটোগ্রাফারই হোন্ না কেন তখন বুঝতে হবে যে উনি সেই কর্মীকে খারিজ করছেন । কাজেই এই **মহাবীর যোদ্ধা- চন্দন সিং রাঠোরের** অনুমতি বিনা, এই হোটেল চত্বরে কাজ করা অসম্ভব । এমনকি সমস্ত ডিসিশানও উনি কাল্টিভেট করেন । তারপর ছবি উঠলে বোঝা যায় যে সম্মতি আছে । ছবি ওঠা হল কম্পিউটারের এন্টার বা রিটার্ন সুইচের মতন । অর্থাৎ প্রোগ্রাম এবার চলবে ।

তাই লোকেরা ওকেই মালিক ধরে আর অন্যরা তার কর্মী । সবাই ওর জন্যই কাজ করে । কেউ প্রশ্ন করেনা , জবাবও চায়না । ওরা রহস্যেই বাঁচে ।

Secrecy is the element of all goodness; even virtue, even beauty is mysterious.--Thomas Carlyle *(1795-1881) British historian and essayist.*

এই আজব ভৌতিক হোটেলে কাজ নেয় বিজলী কিছুটা কৌতুহল বশেই । আর এরা ওকে কুকুর নিয়ে থাকতে অনুমতি দেয় । রাঠোর বলেছে, তাই । কুকুরের সাথে যখন ওর বিয়ে হয় তখন কুত্তা ছিলো চারমাসের শিশু । সহজেই মুত্রত্যাগ করতো আর সারা ঘরে ছুটে বেড়াতো । মুত্রত্যাগ খুব ইম্পর্টেন্ট । নাহলে বধূরূপে অস্বীকৃত । আর বৈধব্যর জ্বালা থেকে বাঁচাতে লোকে শিশু সারমেয়ই খুঁজতো ।কুকুর মারা গেলেই বৈধব্য ।

এখন নবাবের বেশ বয়স হয়ে গেছে তাই বিজলীর সাথেই আছে । যেকটা দিন আর বাঁচে বৌয়ের সেবাযত্নেই বাঁচুক ! সেই দম্পতি ওকে ছেড়েছে ।

এই আর কি । আর বিজলী এখন রোজগেরে গিন্নী । কাজেই কুকুর অবসর নিলেও অসুবিধে নেই । এই অদ্ভুত ভূতুড়ে আবাসে ওরা আছে ।

লোকজন খুব ভালো এখানে । যেহেতু মালিক অশরীরি তাই পাওনাগন্ডা বুঝে নিতে কর্মীদের কোনো অসুবিধে হয়না । নেই হিংসার পরশ । কারণ চন্দন সিং রাঠোরের নজর এড়ানো দায় । কোনো নোংরা রাজনীতির খেলা এখানে নয় । প্রেতের হাতে যাবে প্রাণ । অকালে । ওকে কেউ তো আর লিগালি কিছু করতে সক্ষম নয় কাজেই ।

এখানে এসে বিজলী ভালই আছে । শুধু কুমুদ দাদা আর ওর নতুন পরিবারের বাবা ও মা খুব দু:খ করে । বলে ::: শেষমেশ ভূতের খপ্পড়ে পড়লো মেয়েটা এত্তো পড়ালেখা করে ?

মজার ব্যাপার হল যে আজ পর্যন্ত বিজলীর দুটো বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও ও কুমারী । একজন স্বামী তো পরম ব্রহ্ম আর অন্যজন পশু । একজনের কৃপালাভে ও ধন্য আর অন্যজনের বিশ্বাস পেয়ে পেয়ে ও নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করে । কিন্তু সত্যি সত্যি বিয়ে মানে যা তা তো আর হয়নি তাই ও এখনও টেকনিক্যালি ভার্জিন ।

দু:খ যে হয়না তা নয় -কিন্তু কী আর করা ?

ও তো অনেক বই টই পড়ে কাজেই জানে যে একটা জিনিস আছে মেডিসিনে ; যাকে বলা হয় ইংলিশে ::

spontaneous orgasm----!!

এই ব্যাপারটা হল এই যে মেয়েদের নিজে থেকে অর্গাজম হয় । কোনো ফিজিক্যাল মিলন ছাড়াই । অনেকেই করে এটা । অনেকে সাদা আলোর বিচ্ছুরণ দেখে এই সময় । সেই সময় এত্তো আনন্দ হয় !!

যদিও অনেক সমাজে এগুলি ট্যাবু কিন্তু মেয়েদের মধ্যে যারা সাহসী তারা এগুলি করে থাকে । এতে রোগভোগের সমস্যা নেই আর দেহক্ষুধাও থাকেনা শুধু শুধু । স্বামীরও দরকার নেই । নেই প্রেগনেন্ট হবার ভয় । বেশ জিনিস এটা ।

নিজে থেকে সে অল্প অল্প করে এটা প্র্যাকটিশ্ করতো । শয্যায় শুয়ে । কুকুরটা ওর ঘরেই থাকতো । সে আবার এই সময় খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকতো । যেন বৌ পরকিয়া করছে !

এইরকমই একদিন ও হঠাৎ দেখে যে চন্দন সিং রাঠোর যেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে ।

সেই মুখ, সেই চোখ, পাগড়ি , গোঁফ সমস্ত নিয়েই ।

জলজ্যান্ত মানুষটা, ওর অন্ধকার ঘরেই একফালি চাঁদের আলোর মতন দন্ডায়মান ।

ঘোর কাটতে একটু সময় লাগে বিজলীর ।

তারপর দেখে চন্দন সিং হা হা হা করে হাসছেন ।

বলে ওঠেন ::: কি মেয়ে, এখানে একা একা শুয়ে এসব কী হচ্ছে ?

একটু ঘাবড়ে যায় বিজলী । কারণ মালিক চটে গেলে চাকরি চলে যেতে পারে । ওর জন্য এই চাকরিটা - সোনায় মোড়া । থাকা-খাওয়া ফ্রি । কোনো পলিটিক্স নেই আর মাইনে খুব ভালো ।

ওকে অবাক হতে দেখে চন্দন সিং যেন বলে ওঠেন:: : আমি রাগ করিনি । তোমার সাহস দেখে বাহবা দিতে এলাম । আমাদের দেশে মেয়েরা লেখাপড়া শিখেও যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে পারেনা । কোনো না কোনো পুরুষের বাহুবল ওদের সম্বল । কিন্তু তুমি একটি অবলা জীবের স্ত্রী হয়েও নিজেই নিজের জৈবিক চাহিদা মেটাচ্ছো , কাজ করে ভালো মাইনে পাচ্ছো আর এত চ্যারিটি করছো দেখে তোমাকে কনগ্র্যাচুলেট না করে পারলাম না । তুমি সব্যসাচী । আমি তোমাকে মন দিয়েছি , আমাকে তোমার স্বামীত্বে বরণ করবে ?

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় বিজলী । তিননম্বর স্বামী শেষমেশ এক প্রেতাত্মা ? জৈবিকদিক্ নিজেই সামলে নিতে পারে কিন্তু প্রেত স্বামী যদি ক্ষতি করে ?

মনে নানান দ্বন্দ । নানা ভয় । বিপদ ও শ্বাপদ সঙ্কুল এই জগতে ও একা । কাজেই একটু ভেবেচিন্তে কাজ করবে । সময় চেয়ে নেয় চন্দন সিং এর কাছে ।

তারপর সংবাদ দেয় কুমুদকে ।

কুমুদ শুনে হেসেই খুন -- বলিস্ কি ? শেষপর্যন্ত ভূত বর ? ভূতিয়া মরদ ?

সবাই জানে যে রাঠোর আজও ঐ হোটেলের মালিক । হোটেলে মানে সুবিশাল এক দূর্গ । কাজেই তার স্ত্রীর মর্যাদা পেলে বিজলীর ভাগ্য খুলে যাবে । পয়সাকড়ি ও পাওয়ারের আর সমস্যা থাকবে না কিন্তু এরকম এক পতি, বাস্তবে কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা নিয়ে ওর যথেষ্ট সংশয় আছে । কাজেই অনেক ভাবনাচিন্তা করে ওরা দুজন । আর রাঠোর যখন নিজে ওকে বেছেছেন তখন ও আর পালাবে কোথায় ? ভূতের হাত থেকে পালানো এত সহজ ?

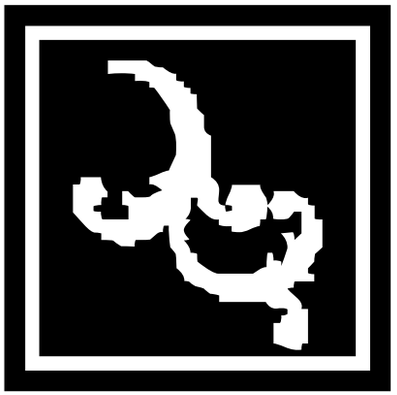

সতীপুরের পবিত্র নদী কাবেরী । সেই কাবেরীর তীরে হিন্দুদের পোড়ানো হয় । আজকাল কাঠের আকাল । গাছ কাটা , বৃক্ষ-ছেদন বারণ । কাজেই স্বল্প কাঠে চিতা জ্বালাতে হয় । বেশির ভাগ সময়ই আধপোড়া মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকে নদীপাড়ে । সেই দেহাংশ আর পোড়া কাঠের অংশ ও ভস্ম কুড়িয়ে তোলে কিছু মানুষ । তারপর সেগুলি তারা নদীতে ফেলে দেয় । পবিত্র নদীর জলে ভেসে যায় মৃতের দেহাংশ যাকে দর্শনের ভাষায় বলা যায় সলিড থট্ ।

অনেক কিশোরকেও দেখা যায় এই কাজে নিয়োজিত । কিছু সংস্থা এইকাজের ভার নেয় । তারপর শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করায় ।

লাইব্রেরিতে,একটি সেকেন্ড হ্যান্ড বই পড়েছিলো বিজলী । এক গবেষকের লেখা । শিশুশ্রম ও শিশুদের জন্য আইন নিয়ে । সেখানে এই তথ্য পেয়েছিলো ।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায় মাথায় । চন্দন সিং কে যদি সে বিয়ে করে আর সতীপুরে গিয়ে ওরা হোটেল খোলে তাহলে কোনক্রমে এই প্রথা বন্ধ করা যেতে পারে ।

কুমুদ বলে ওঠে :: আমি বাপু অত টাকা খসাতে পারবো না । ওখানে খাবারের দোকান আমার চলবে কিনা জানিনা । এখানে রমরমা ব্যবসা । আমি সেই দোকান তুলে দিয়ে ওখানে যেতে পারবো না । তোমার ইচ্ছে হয় তুমি বাপু যাও ।

বিজলী নিজে তো দরিদ্র ঘরের মেয়ে তাই ওদের জন্য মনে মনে কাঁদে । এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়না । বলে :: না না, আমি রাঠোরকে বিয়ে করে ওখানে হোটেল খোলার কথা বলছিলাম ।

আবার বলে :: চন্দন সিং আমাকে ছাড়বে না । কাজেই যদি আমি এর থেকে কিছু ভালো জিনিস বার করতে পারি তো মন্দ কি ?

কুমুদ জোরে জোরে মাথা নাড়ে । হু হু হু হু ----!

ঠিক হয় যে ও বিয়েতে সায় দেবে । আর বিয়ে হবে খুবই লো- প্রোফাইল । মিডিয়া যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় -- **প্রেতের সাথে মানবীর বিয়ে**, এরকম উদ্ভট

কান্ড তো আধুনিক মানুষেরা তেমন দেখেনা কাজেই শোরগোল হবেই আর বিজলী ঠিক সেটাই চায়না ।

চন্দন সিং অসম্ভব বীর হলেও কোনোদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি । হয়ত যুদ্ধ করে সময় পেতেন না , কে জানে ? কাজেই এই যার ফার্স্ট ফ্লেম ও ম্যারেজ তাও **সুক্ষ্ম কায়া নিয়ে** তার বিয়ে, প্রবল মিডিয়া কভারেজ পাবে সেই বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই আর আজকাল যা চ্যানেলের ঘটা ও সংখ্যা ! এরকম নিউজ দেখাতে পারলে প্রচুর হিট্স্ হবেই । নাম ও ফেম বাড়বে চ্যানেলের । সেজন্য বিজলী স্থির করে যে বিয়েটা চুপিচুপি করবে ।

শুনলে অবাক হতে হয় যে **কুকুর নবাব** একদিন হঠাৎ মারা যায় । বয়স হয়েছিলো ভালই । কাজেই । বিজলী বিধবা হয়েই আবার সধবার বেশ পরে ।

বিয়েটা হয়েই যায় সময়মত ।

বিয়ের পরেই ,সমস্ত শ্বশুরকূলের যেমন নতুন রূপ দেখা যায় সেরকম সেও জানতে পারে -- যেই চন্দন সিং রাঠোরের এত সুনাম তিনিই নাকি শেষদিকে

পকেটমারি করতেন । পয়সার অভাবে নয় কারণ তখন এখানে সদ্য এই হোটেল শুরু হয়েছে । তবে কেন ? মজা দেখার জন্য । ওনার মতে, উনি তো রাজা হয়েই জন্মেছেন কিন্তু যারা পকেটমার , চোর তাদের জীবনটা ঠিক কেমন হয় ?

সেটা কিছুটা অনুভব করার জন্যই পকেটমারিতে ঢোকা আর ছদ্মবেশে লোকের পকেট কাটা ।

কয়েকবার জেলের ঘানিও টেনেছেন । এইভাবে অনেকটা সময় কাটান । তারপর এই পেশা থেকে দূরে চলে আসেন । পুরোপুরি হোটেলে ডুবে যান ।

কিন্তু জেলে সময় কাটানোর জন্যই হয়ত ওকে টিবি রোগ , আক্রমণ করে । এবং মারা যান ।

বিবাহ করার ফুরসৎ হয়নি । নিজেকে **মাছরাঙা** বলতেন । বলতেন --আমি মাছারাঙার মতন জলের দিকে চেয়ে আছি ।উপযুক্ত মৎস্য পেলেই মারিব আর খাইবো সুখে , আনন্দে ।

বেঁচে থাকতে সেরকম মাছের সন্ধান নির্ঘাত পাননি ।

এখন মৃত্যুর পরে হয়ত বিজলীকেই সেই মৎস্য-কন্যা ঠাওড়েছেন ।

আস্তে আস্তে জানা গেলো যে চন্দন সিংয়ের আগেও এক মৎস্য প্রিয়া ছিলো । তার নাম ছিলো সুহানা । প্রত্যন্ত এক অঞ্চলের এই মেয়ে যেই উপজাতির মেয়ে তাদের মধ্যে মাত্র ৫০০জন তখন জীবিত ছিলো কারণ তারা বাইরের লোকের সাথে বিয়ে শাদী করতো না আর জেনেটিক কারণে তাদের সন্তান কম হত । এদের নাম **রেহপোপির** ।

এই কমিউনিটির মেয়েরা পর্দার আড়ালেই থাকতো কিন্তু সম্প্রতি তারা বাইরে আসা শুরু করে ।

যদিও এরা আশেপাশের এলাকার সঙ্গে বার্টার সিস্টেমে ব্যবসা করতো কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু নিজস্ব পেশাও ছিলো । যেমন মুখোশ বানানো ও মেহেন্দি শিল্প । মেয়েরা মেহেন্দি পড়াতো আর পুরুষেরা মুখোশ তৈরি করতো । ধর্মীয় মুখোশ আর নাচের মুখোশ আলাদা হত । ভালো কারিগরেরা ধর্মের গুলি বানাতো । এইরকমই এক মেয়ে **মেহেন্দি শিল্পী সুহানা** । সে এত সুন্দর কারুকার্য করতো যে লোকে ওকে খুবই বাহবা দিতো আর ও বেশ লোকপ্রিয় ছিলো ।

হয়ত সেইকারণে চন্দন সিংয়ের বোনের বিয়েতে তাকে আনা হয় ঐ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ঘোড়ার পিঠে করে । পথে ঘোড়সওয়ারের মৃত্যু হলে চন্দন সিং তাকে নিজের অশ্বে করে নিয়ে আসেন । খুবই মধুময় ও রোমান্টিক সেই যাত্রা , সুহানার সুহানা সফর ।

মেহেন্দি শিল্পের সাথে সাথে সুহানা মুখোশের কারুকার্যও শিখেছে । ও মুখোশও বানাতে পারে । অনেক লোকই ওর মুখোশ কেনা শুরু করেছে নাচের জন্য । আর ও হল ওদের উপজাতির মধ্যে প্রথম মেয়ে যে মুখোশ বানাতে পারে । ওদের প্রিস্ট , যার কথায় ওরা ওঠে-বসে সে ওকে বারণ করেছিলো এগুলো করতে কিন্তু ও স্বাধীনচেতা । কারো কথা শোনার বান্দা নয় । বিশেষ করে অযৌক্তিক জিনিস ।

ওদের একজনই দেবতা, তা হল সূর্য আর একজনই দেবী তাহল বৃষ্টির দেবী । রেন গডেস । আর ঐ প্রিস্ট সমস্ত স্থির করে কীভাবে সমাজ চলবে ।

সুহানার প্রেমে পাগল চন্দন সিং । তার জন্য যা ইচ্ছে করতে পারেন । সুহানাও মন দিয়েছিলো কিন্তু ভিন্ন জাতির মানুষ ও শহুরে লোক হওয়ার কারণে ওর রেহপোপির জাতি ওকে এই বিবাহে সম্মতি দিতে বারণ করে । সুহানা নিজের জন্য ভাবেনি । ও সাহসী । কিন্তু ওর পরিবার ও ছোটবোন মহুরের জন্য সে চিন্তিত

। ও চন্দন সিং রাঠোরের স্ত্রী হলে ওদিকে মহুরের বিয়ে হবেনা । ওদের রেহপোপির কমিউনিটির যারা উপযুক্ত পাত্র তাদের কেউই ওকে বিয়ে করবে না। ওরা একঘরে হয়ে যাবে । হয়ত সেইকারণে সুহানা ওর প্রেমিককে ত্যাগ করে চলে যায় ।

সুহানার উপজাতি রেহপোপিরের মানুষ ঘোড়ার মাংস খায় । মিষ্টি ও স্বাস্থ্যকর এই মাংস আবার চন্দন সিংয়ের পরিবারের জন্য বিষ । ঘোড়া হল রাজা ও যোদ্ধাদের পরম বন্ধু । তাকে মেরে খেয়ে ফেলা অত্যন্ত পাশবিক কাজ বলে মনে করা হয় । কিন্তু রেহপোপিরের মানুষ ওদের আদিকাল থেকে খেতে অভ্যস্থ । তাই সেই ব্যাপারেও বিরোধ ছিলো দুজনের পরিবারের মধ্যে । কিন্তু মিঁয়া ও বিবি রাজি হলেও শেষকালে নিজেদের কূলবংশ প্রথাকে মর্যাদা দিতে ওরা নিজেদের প্রেমকে বলিদান দেয় । চন্দন সিং আর নারীতে লিপ্ত হননি । সুহানার খবর উনি লুকিয়ে রাখতেন । প্ল্যাটোনিক লাভ । সরাসরি যোগাযোগ রাখেননি কারণ তাহলে সুহানার ম্যারেজটা স্পয়েল হবে । সে তার স্বামীর প্রতি লয়াল থাকতে পারবে না । বিয়ে হয়েছিলো তারও এক বুড়োর সাথে । সেই বুড়োর

আগে চার চারটে বৌ ছিলো, সবাই মৃতা । গন্ডাখানেক সন্তান তার । সুহানার **বিলাইতি প্রেমিক** ছিলো বলে কোনো যোগ্য পুরুষ ওকে বিয়ে করেনি । তাই এই বুড়োর গলায় বরমাল্য দিতে একপ্রকার বাধ্য হয় । মজার ব্যাপার হল বুড়োর যত বৌ আছে সবাই একে অপরের থেকে অনেক ছোট । মানে বয়সের সাথে সাথে সে কচি মেয়েদের দিকে হাত বাড়িয়েছে ।

বলতো :: রাতে ঢ্যাড়স্ সিদ্ধর সাথে গরম দুধ আর মিস্‌রি খেয়ে শুলেই ডান্ডা খাড়া থাকবে ।

চন্দন সিং রাঠোর শুনেছেন যে সুহানাকে ওরা বাইরে থাকতে দিয়েছিলো । অন্দরে ওকে যেতে দিতোনা ওর বরের সন্তানেরা । ও মেহেন্দি আর মুখোশের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রাখতো নিজেকে । ওকে দেখে অন্য মেয়েরাও মুখোশ শিল্পে হাত লাগায় আর ভালো করে । অনেক ক্ষেত্রেই ওরা পুরুষদের থেকে ভালো কাজ করে । নতুন ডিজাইন আনে এই ক্ষেত্রে । সুহানার তৈরি এক ডিজাইনার মুখোশের নাম ছিলো **খাম্বাজ** ।

সেই মুখোশ রাজা মহারাজারাও কিনে নিয়ে যেতো ।

কাস্টম বিল্ট মুখোশও ঐ প্রথম ওখানে চালু করে । তাতে ওদের ব্যবসা আরো বাড়ে । বিদেশীরা ওখান থেকে মুখোশ কেনা শুরু করে । সরকারের মাধ্যমে ।

পুঁথির মুখোশ ও ঘুঙুরের মুখোশও সুহানা ওদের মধ্যে চালু করেছিলো । কিন্তু এত গুণী মেয়েটির নিজস্ব জীবনে ছিলোনা কোনো শান্তি । যে মহারাণী হবার আহ্বানকে ঠেলে ফেলে, আত্মত্যাগ করে পরিবারের কারণে তাকেই দূরে ঠেলে দিয়েছিলো তার পরিবার, কমিউনিটি আর শ্বশুরকূল । প্রগাঢ় প্রেমের অপরাধে ।

চন্দন সিংয়ের কিছু করণীয় ছিলো না । কারণ ওদের এলাকায় তার প্রবেশ নিষেধ । নিষাদের তীরের শিকার হতে পারেন বলেই চুপ করে ছিলেন । নিজের স্বাধীনচেতা প্রেমিকাকে শেষ সময়ে শুধু দহনের ছায়ায় আর মৃত আবেগেই দেখেছেন । দহন , জ্বালা , হেমলক পান ।

মৃত্যুর পর সুহানাকে দাহ করার কেউ ছিলো না । শেষে ওর কাজের জগতের কিছু মানুষ একটি ঘোড়ার পিঠে মৃতদেহ শুইয়ে ওকে বনে ফেলে আসে । হয়ত চিল শকুনের খাদ্য হয় সে ।

চন্দন সিং মর্মাহত হলেও কিছুই করার নেই তার । অদ্ভূত নিয়ম মানব জগতের । কিছু কিছু নিয়ম সত্যিই প্রয়োজন আর কিছু কিছু নিয়মের শিথিলতাই কাম্য ।

নিয়ম চুরমার ।

Portrait of Bernardo de Galvez

A number of spirits reportedly haunt The Hotel Galvez in Galveston, TX. However, the stories surrounding the portrait of Bernardo de Galvez are some of the most chilling.
Born in 1746, Bernardo de Galvez was a Spanish military leader who aided the American colonies during the Revolutionary War. Bernando, who died in 1786, is also Galveston's namesake.

A portrait of Bernando de Galvez hangs at the end of a downstairs hallway at Hotel Galvez. Legend has it the portrait's painted eyes follow guests as they walk by. People who approach the painting often feel chilled or uneasy. The portrait's haunted reputation naturally appeals to tourists who try to photograph the painting. However, it seems guests can't get a clear photo unless they ask Bernando for permission. A paranormal investigation team snapped a picture of the infamous portrait, but the photo was marred

by a skeletal image. Perhaps they forgot to ask the long-dead Bernando for his consent to be photographed !!

Information from :::

http://ghostsnghouls.com/tag/bernando-de-galvez-portrait-haunted/

সুহানার মৃত্যুর পরে মুষড়ে পড়েন চন্দন সিং । তারপর থেকেই ওর যুদ্ধে যাওয়া একপ্রকার বন্ধ ।

পকেটমারিও কিছুটা সুহানার জন্যই শুরু ।

রাজার খেতাব তো বদলাতে পারবেন না কিন্তু নিজেকে চোর জোচ্চোর তো করতে পারবেন যাতে লোকে তাকেও নিচু চোখে দেখে , রেহপোপির উপজাতির মতন ; যারা **অশ্বমেধ যজ্ঞ নয় অশ্ব-বধের** মতন ঘৃণ্য কাজ করে ও একধরণের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী ।

যখন ছদ্মবেশে পকেট কাটতেন তখন দু-তিনবার সুহানার ডেরাতেও গেছেন । কিন্তু বিবাহিতা দয়িতাকে শুধু চোখের দেখা দেখেই চলে এসেছেন । তাকে ছোঁয়ার কিংবা তার সাথে আলাপ করার বাসনা ত্যাগ করেই ।

রাজারা কী না পারেন ? ইচ্ছে করলে সুহানাকে তুলে আনতে পারতেন যেমন আগে বহু রাজা নানান রাজ্যের রূপসীদের নিয়ে আসতেন । বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে ।

কিন্তু উনি সেই পথে যাননি । সুহানার পরিবারের জন্য ত্যাগকে মর্যাদা দিয়েছিলেন । আজ হঠাৎ এত যুগ পরে উনি আবার বিয়ে করতে চান তাও এক সাধারণ মেয়েকে ।

বিজলীকে এই কাহিনী ও চন্দন সিংয়ের এই অপূর্ব ইচ্ছে মোহিত করে ।

বিয়ে হয়েই যায় আর চন্দন সিং রাঠোর জানতে পারেন সতীপুরের চিতাভস্মের সাথে জড়িত এক করুণ কাহিনী । কিছু শিশু , যাদের খেলেধূলে সময় কাটাবার বয়স তারাই নদী কিনারায় দিনকাটায়, অপরিচিত মানুষের চিতাভস্ম ও পোড়া দেহাংশ কুড়িয়ে ।

তাদের শৈশব নেই , কৈশোর নেই , যৌবন নেই । আছে কেবল মৃত্যুর হাহাকার আর উদাস মেঘ । কালো মেঘে ঢেকে গেছে তাদের চেতনা । কামিনী ফুল আর কাঠগোলাপের সুগন্ধে মাতেনা ওদের প্রতিটি লগ্ন । ওরা ভ্রষ্ট । নষ্ট সমাজের হাতে ।

মেঘ ওদের জীবনে থ্রিলারের উৎস । আর ঘাতক মেঘ ওদের পোশাক । আর মেঘই ওদের আশাবরী কিংবা মেঘমল্লার । কেবল কণ্ঠের বদলে এই উচ্চাঙ্গের

কথাকলি ওদের আঁখিপল্লবে । হৃদয়ে বৃষ্টি ঝরায় , অসময়ে । মৃত্যুর পোশাক পরে ওরা ঘোরে , পুষ্পবনে---কুঁড়ি ফোটার মধুঋতুতে , ভ্রমরের গুঞ্জনে ।

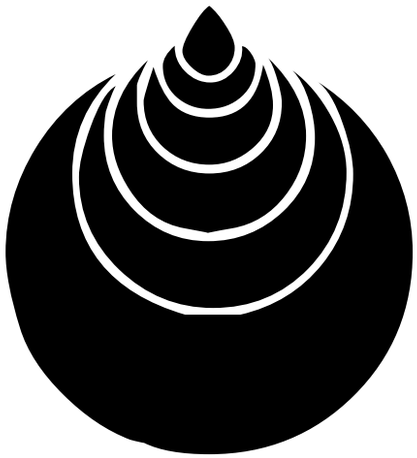

যেহেতু চন্দন সিং এখন প্রেত তাই উনি সর্বত্র স্পিডে যান । আর ওর কোনো পারমিট লাগেনা , কোথাও যেতে । হয়ত সেজন্য উনি ঘুরে এলেন একাই, সতীপুরের নদী কিনারা থেকে । পবিত্র কাবেরী নদী এখানে । কচি কচি শিশুদের রুটিরুজি অপরের অর্ধ পোড়া দেহাংশ আর চিতার ধূলিকণা ।

কুমুদ আর বিজলীও গিয়েছিলো । আলাদা আলাদাভাবে । চন্দন সিংয়ের এই লো-প্রোফাইল বিয়ের কথা কেউ জানেনা । বিজলীর সারমেয় স্বামী ওর পরম বিশ্বাস ভাজন ছিলো । সততার পরাকাষ্ঠা । আর চন্দন সিং রাঠোর প্রেতলোক থেকে ওকে রক্ষা করার ভার নিয়েছেন । আজ ওদের হোটেলে বিজলী বিশেষ আদৃতা । মালিকের পত্নী হিসেবে । কুমুদের লোকপ্রিয় কাফে এদের হোটেলের সাথে সম্পর্ক পাতিয়েছে । কুমুদ মানুষ ভালো আর ভালো শেফ্ । কাজে কাজেই ।

Dame Daphne du Maurie এর ***Rebecca***--র

মতন ঘটনা । বিজলী ; চন্দন সিং এর মৃতা প্রিয়া সুহানার ছায়া দেখতে পায় ঐ হোটেলে । আর কেউ দেখেনা ওকে বা দেখেও-নি । কোনোদিনই ।

ওকে যেন ফলো করে সুহানা । ভালোমন্দ জানতে চায় । আর প্রেতের স্ত্রী বিজলী অন্য এক প্রেতিনীকে ভীষণ ভয় পায় । কেঁপে কেঁপে ওঠে ওর সর্বসত্ত্বা । **যেন সুহানার গদিতে ও বসে পড়েছে ।**

ওর এলাকায় প্রবেশ করে, ওরই প্রেমাস্পদকে কেড়ে নিয়েছে । হয়ত ওর প্ল্যান ছিলো পরজন্মে চন্দন সিং এর বাহুবন্ধনে ডুবে যাবে । কিন্তু **মাছরাঙা রাঠোর** এখন পার্থিব এক মৎস্যকন্যার প্রেমে পাগল । তার চেতনা অবলুপ্ত হয়েছে , অজান্তেই ।

সেইকারণে হয়ত সুহানা ঈর্ষান্বিতা । কে জানে ?

অশরীরি সংবাদ **কজনই বা পায় আর মানে ?**

মনে প্রশ্ন জাগে বিজলীর :: এই চন্দন সিং কে ?

সুহানার পরিচয় কী ? কেন এই হোটেল ; এক প্রেতের হুকুম মেনে চলে এই ২০১৬ সনে ? কেন ?

ভীষণ ভাবছে কদিন ধরেই ।

কুমুদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাকেও বলেছে। কুমুদ তো ভারি খুশি । চন্দন সিংয়ের ব্যাটেলিয়ান গিয়ে সতীপুরের শিশুকূলকে রক্ষা করেছে ঐ পাশবিক সংস্থাগুলির হাত থেকে । ওখানে এখন থেকে মেশিন দিয়ে মাটি সাফ হবে । মেশিনই আলাদা করে ফেলবে মাটি আর হাড়-মাংস । বাচ্চাগুলি এখন স্কুলে ভর্তি হচ্ছে এক এক করে । ওরা ফ্রিতে পড়ে । চন্দন সিং রাঠোরের কৃপায় ওদেরই সংস্থা খুলেছে স্কুল, সতীপুরে । তবে সেখানে বিদ্যালাভের পরে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই স্কুলের ক্লাসরুম, বাথরুম, বারান্দা সব ক্লিন করে দিয়ে আসে । এটা ওরা স্বেচ্ছায় করে ।

আর ওরা ক্ষেতে সবজি চাষ করে । ছোট ছোট গাছ লাগিয়ে সবজি ফলায় । তারপর হোটেলের কিচেনে বিক্রি করে । মজার ব্যাপার । কচি হাতের অর্গ্যানিক ফসল আর কি ! হোটেলে এগুলি **ক্লিন গ্রীন** নামে বিকায় ।

কুমুদ বলে :: কার ভাগ্যে কী শিকে ছেড়ে কে জানে !

মড়ার মাংস খুবলে খেতো দুদিন আগে আর আজ দেখো, কত বড় বড় মানুষ এদের হাতে তৈরি সবজি খেয়ে বাহবা দিচ্ছেন । ওহে জামাই বাবাজী যুগ যুগ

জিও-- জিও চন্দন সিং রাঠোর , ভূত হয়েই ! বলেই ফিক্ করে হেসে ফেলে ।

তারপর বিজলীর প্রশ্নের উত্তরে বলে ওঠে :: তোদের পড়ুয়াদের এই এক সমস্যা । সবকিছুর হিসেব মেলা চাই । নাহলে ঘুম হয়না । আরে যে যত জানে তার অশান্তি তত বেশি । শেষকালে পন্ডিতেরা বদ্ধ পাগল হয় , জানিস্ না ? তুই চন্দনের স্পর্শ লুটেপুটে নে । চন্দন গাছের খবর জেনে কী হবে ?

মনে পড়ে বিজলীর যে বোদ্ধাদের ব্যাপারে কোনো এক বিখ্যাত ব্যাক্তি বলেছেন :: :: They Suffer Paralysis By Analysis---

বিজলী তো অনেক বই পড়েছে ও পড়ে । ওর নতুনের চেয়ে পুরাতন বইয়ের গন্ধ ভালোলাগে । কারণ ও লাইব্রেরিতে পুরনো বই পড়তো । বাজারে একধরণের পারফিউম এসেছে যাকে লোকে পুস্তকবাস বলে । সেই সেন্টের সুবাস পুরনো বইয়ের মতন । বিজলী ওগুলি কিনে আনে আর ঘরে ছড়িয়ে দেয় । ভালোলাগে বইপাগল মেয়ের এই মন উজাড় করা গন্ধ । অবসেশানের চেয়ে প্যাশন ভালো । তবুও বই ওর

অবসেশান হয়ে গেছে । সবকিছুতে লজিক খোঁজে । অনুসন্ধান করে । তাতে জীবনের রং চটে যায় কোথাও কোথাও । তবুও মন মানেনা । কিছুটা হয়ত **বিবলিওমেনিয়াক** -ও । একই বইয়ের বহু কপি কিনে রাখে পাছে হারিয়ে যায় জ্ঞানভান্ডার !

মূর্খ কুমুদ বলে :: বই তো পাতা দিয়ে তৈরি । আসল জ্ঞান তো তোর মনে মনে থাকবে ! বই আঁকড়ে কী হবে ?

বিজলীও ভাবে, সত্যি তো প্রথম বইটা যে লিখেছিলো তার জ্ঞান এলো কোথা থেকে ? নিশ্চয়ই মনে মনে । শুনে শুনে । কাজ করে ও ফল পেয়ে পেয়ে ।

দেওয়ালে ওর স্বামীর বিশাল পেন্টিং । কিন্তু উনি সর্বত্র বিরাজমান । আর ছায়ামানুষ হয়ে আছে সুহানা । তার কষ্ট ফুটে ওঠে মাঝে মাঝে আর্শিতে । রক্তকণিকা হয়ে । কিন্তু আর কেউ সেগুলি দেখতে পায়না ।

আর চন্দন সিংয়ের ছায়াশরীরের পরশ পায় বিজলী ।

মধুরাতে । তখন ওর নিজে থেকে অর্গাজম হয় । যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে বলে spontaneous orgasm---

Fusion tantra বলে ::

Tantric Masturbation, *Orgasm with Spirit.*

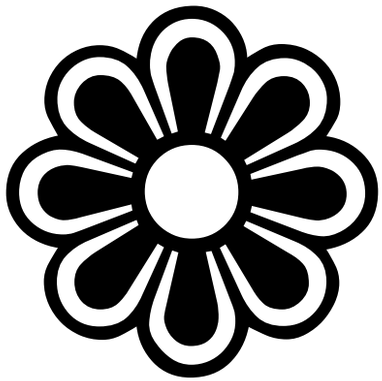

বিজলীর মনে হয় যে চন্দন সিং রাঠোর আসলে একটি মহাকাশের পোর্টফোলিও । যেখানে আবেগ , প্রেম, দয়া , কর্তব্য এসবের সাথে সাথে আছে চেতনার স্বত:স্ফূর্ত বিচ্ছুরণ । তাই বুঝি উনি মরে গিয়েও জীবিত । ওকে কেউ আসলে দেখেনা । অনুভবও করেনা । যখন মনে হয় উনি অনুমতি দিচ্ছেন সেটা আসলে **সময়ের ঘোড়ায় চড়ে** পেছনে ফিরে যাওয়া । বার বার অতীতকে ওরা রিপিট করে । ওরা ভাবে চন্দন সিং রাঠোর এখন অস্থিমজ্জায় থাকলে কী বলতেন ? কী ভাবতেন আর কী করতেন ? সেইভাবেই ওরা মানসিক প্রস্তুতি নেয় আর কাজ করে চলে । হয়ত

এই মানসিক দ্যুতি থেকেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় তাই ক্যামেরা বন্দী ছবি চোখের আড়ালেই রয়ে যায় । আর লোকে মনে করে যে উনি না চাইলে ছবি ওঠেনা ।

উনি আলোর স্ফুলিঙ্গ নিয়ে খেলতে জানেন ।

তাই বুঝি রেবেকার মতন সুহানার ছায়াও ধাওয়া করে বিজলীকে । আসলে বিজলীর মনকে । অবচেতনে ।

আসলে সুহানা অথবা চন্দন সিং নয় বিজলীর আনন্দে বাধা দিচ্ছে তারই অবচেতন মন ।

লজিক/ যুক্তি এবং চিন্তার জাল থেকে বেরিয়ে বিজলী বুঝতে পারে বা অনুভব করতে পারে যে প্রয়াত চন্দন সিং রাঠোর এক **কালেকটিভ কনশাসনেস্** ।

সমাজে যার নানান অংশ বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে অজান্তেই । কখনও সুহানার ছায়া হয়ে , কখনও হোটেলের পরিচালক হয়ে আবার কোনো কোনো সময়ই নিছকই কারো স্বামী হয়ে । এই বিযুক্ত প্রেত আত্মা আসলে লুকিয়ে আছে বিজলী ও অন্যান্য মানুষের চেতনার কণা হয়ে কোনো গভীর , গোপন মন গহ্বরে । যার প্রতিটি টুকরোকে জুড়ে বিভিন্ন মানুষ

বিভিন্ন সময় রূপ দিয়ে চলেছে নানান কাহিনীর ও সত্ত্বার ।

এইজন্যেই মনে হয় বলা হয় যে মহাকালের স্রষ্টা আমরাই । সময় ও কাল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কাহিনী দিয়ে । যা অনিন্দ্য সুন্দর ও কালজয়ী । যা শিক্ষণীয় ও স্পর্শকাতর । তাই বুঝি বিজলীর অদেখা , রেখাহীন , সীমাহীন , তড়িৎ গতিতে চলা পতিদেব , চন্দন সিং রাঠোর এক কালপুরুষ ।

শুধু আজ গান্ডীবের বদলে তার হাতে অজস্র প্রেম ও ক্ষমার মশাল ।

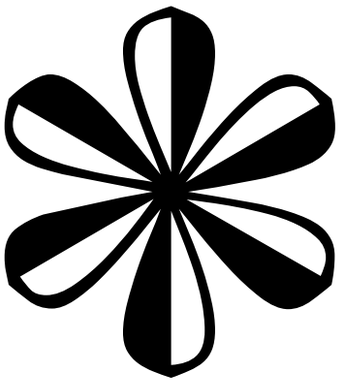

“We were the people who were not in the papers. We lived in the blank white spaces at the edges of print. It gave us more freedom.
We lived in the gaps between the stories.”
– Margaret Atwood, The Handmaid's Tale

গথিক চার্চ

গথিক চার্চ

ময়না এক বাঙালী মেয়ে । পেশায় অ্যানিমেটর । বিবাহসুত্রে বিদেশে থাকে । দেশের নাম ওলিম ।

স্বামী মৈনাক ; স্পেস সায়েন্স নিয়ে কাজ করে । ময়না আগে স্পেস সায়েন্স এর জন্য অ্যানিমেশান করতো । এখন সে গল্পকথা নিয়ে কাজ করে । থ্রি- ডায়মেনশান এর মডেল বানিয়ে সেগুলি নিয়ে নড়াচড়া করায় । ও আসলে শহর, মানুষ , পশুপক্ষী , ঘরবাড়ি তৈরি করে তারপরে সেগুলি নানান গল্পে বসায় । সিনেমা বানায় আরকি !

জুরাসিক পার্ক দেখে এই বিষয়ে উৎসাহ বাড়ে । অনেক জানে , শেখে । তারপর এক স্পেস বিজ্ঞানীর ঘরনী হয়ে এইদিকে ঝুঁকে পড়ে । বেশ কিছুদিন এক স্পেস

সংস্থার হয়ে অ্যানিমেশানের কাজ করে । তারপর ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে আসে । আগেকার যুগে যেমন পটশিল্পী অর্থাৎ পটুয়া হত আর তারা নানান পটচিত্র একে রোল খুলে খুলে গান গেয়ে গল্পকথা শোনাতো- সেইরকম ম্যাজিকের মতন, কিছু ডিজিট্যাল তন্তুর সাহায্যে বিভিন্ন স্লাইড বানিয়ে গড়ে তোলে এক একটি রূপালি পর্দার কাহিনী ।

পুরো আসল মানুষের মতন লাগে তাদের !

কাজে খুবই মন আছে ময়নার । যার নিজের নামটা নিয়ে মনে খুব দু:খ । কেমন প্রাচীন নামখানা !

আসলে ওর বাবা ছিলেন পটুয়া শিল্পীদের বিশেষ ভক্ত । একটি গ্রামে গিয়ে ওদের সাথে বসবাসও করেছেন । সেই গ্রামের নাম ছিলো ময়না । কাজেই মেয়ের নাম দিয়েছিলেন ময়না । অবশ্য ওর মায়ের নাম ছিলো নয়না ।

নয়না রাণা । ছন্দ মিলিয়ে নাম তাই না ?

নামেই কবিতা । সুগ্রন্থিত ।

কাজেই ময়নাও সুললিত । ললিতকলায় পটিয়সী ।

আধুনিক যুগে অ্যানিমেশান । ও চরিত্র নড়ায় । পর্দায় । আর সেটা ভালোভাবেই করে কাজেই ও খুশি ।

ইদানিং অবশ্য স্বামীর সাথে খুবই মনোমালিন্য চলেছে । ও যেই বাড়িটায় থাকে সেটা ওর নিজের কেনা । দোতলা একটা সুন্দর বাড়ি । পেছনে সমুদ্রের হাতছানি । ঝাউবন । বালিয়াড়ি । সিগাল পাখির ঝাঁক । পথভোলা কিছু রঙীন মাছ আর একটি শক্তপোক্ত জেটি । সেই জেটিতে আজ আর কোনো তরী নোঙর করেনা কিন্তু অনেক পথভোলা মানুষ বসে থাকে । নিচে গাঢ় নীল জল আর সফেন ঢেউ । জেটিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে বৃদ্ধ কোনো মানুষ । ঢেউ এর ফেনা ও গোনাতে খুঁজে পায় নিজেকে । নিজের লুপ্ত যৌবন আর জীবন ! ও যেখানে থাকে সেখানে সমুদ্র ও পাহাড় দুই আছে ।

ময়নার একটি জীপ গাড়ি আছে নিজের কেনা । খুব দামী আর অভিজাত । ও এইরকম গাড়ি পছন্দ করে । যে কোনো জায়গায় চলে যাওয়া যায় । ও তো ক্রিয়েটিভ মানুষ তাই হয়ত ওভার সেন্সিটিভ । অতি অল্পেই আহত হয় , অভিমান হয় । তখন এই জীপ নিয়ে ঘন বনে চলে যায় । **ইয়ারো** নামে একটি নদী আছে যা কিনা ঝর্ণা হয়ে

পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝরে পড়ছে । সেই নদীর ধারে বসে সময় কাটায় । কখনও বা শার্ট , প্যান্ট খুলে নদীতে ঝাঁপ দেয় । সুঠাম দেহ । বাদামী চামড়া । মসৃণ অবয়ব তার । ঠিক যেন এক শিল্পীর স্কেচ !

এইভাবেই স্ট্রেস কাটায় সে। অরণ্যের হাতছানি মেনে তার কাছে যদি যাওয়া যায় তাহলে মন ভালো হয়ে যায় । কিন্তু আঁকাবাঁকা মেঠো জংলী পথে একটা জীপ নাহলে ঠিক যেন জমে না । তাই এই গাড়িটা কিনেছিলো নগদ

পঞ্চাশ হাজার মার্কিনি ডলারে । তাই নিয়ে ওর পতিদেব ওকে প্রায়ই খোটা দিতো । আসলে বিজ্ঞানী মানুষ কাজেই তার মতে এগুলি হল বাজে খরচ । যেখানে রিক্‌শা করে যাওয়া যায় সেখানে মোটরে করে যাওয়ার কোনই মানে হয়না । সেই টাকা কোনো দু:স্থকে দান করে দিলে কাজ হয় ।

ময়না বলে :: আমি লাইফকে এনজয় করতে এসেছি । নিজে পরিশ্রম করে খাই । আমি যদি কোটি টাকার গাড়িও কিনি কারো কিছু বলার নেই । আর আমি যথেষ্ট পরিমানে আয়কর দিই । কাজেই সমাজ সংস্কার না করলেও আমার চলবে ।

এই নিয়েই বাক্‌বিতন্ডা । ওদের যেহেতু কোনো সন্তান নেই তাই স্বামী স্ত্রীর হাতে অঢেল সময় ; কাজের সময়

ব্যাতীত । ময়না নিজে রান্নাও করেনা বাড়িতে । অফিস আর এনজয় করা । এই ওর জীবন । ওদের একটি দল আছে । সবাই মেয়ে । তবে সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত । সেই পঞ্চকন্যা মিলে অনেক মজার মজার জিনিস করে থাকে ।

একবার তো বাড়িতে না বলেই ওরা প্যারিসে চলে যায় এক্সিবিশান দেখতে । সেখান থেকে বাড়িতে ফোন করে ।

ওরা খুব হুজুগে । ওদের মধ্যে রোজি আইয়ার বলে একজন সার্জেন আছে । ভদ্রমহিলা নিজের স্বামীর থেকে অনেক বেশি জনপ্রিয় ও ধনী । সে-ই বেশিরভাগ প্ল্যান করে । মাসের মধ্যে ১৫দিন কাজ করেনা । প্রচুর পয়সা ওর । সবসময় বুক্ড্ থাকে । কাজেই মাঝেমাঝে রিল্যাক্স করে । এবং বেশ ভালোভাবেই !

ড্রেস ডিজাইনার ,ডায়না বিশ্বাস আমাদের ময়নার মতন বাঙালী মেয়ে ।

সে আবার খুব খাদ্যরসিক । কাজেই তার প্ল্যান হল সবসময় এমন জায়গায় যাওয়া যেখানে সুস্বাদু খানা পাওয়া যাবে । অর্থাৎ ওদের হেঁসেলের দায়িত্ব ডায়নার । আর ওকে ওরা বিশ্বাসও করে ! ফরাসী ক্রেপ (মিষ্টি রুটি) আমাদের পাটিসাপ্টার মতন ভেতরে পুডিং ভরে খায় । বাড়িতে পিৎজা বানায় । ওদের ইতালীয় বান্ধবী

অ্যানেট্ সেগুলি করে । ওদের তৈরি পিৎজাও খায় । তবে খুব একটা খুশি নয় খেয়ে । বলে :: হয়নি কিছুই ।

পতিদেবের ওটাও আরেকটা রাগের কারণ । এই মেয়েলি দলের বেকিং কুকিজ্ , খেয়ালি আড্ডা আর যখন তখন এখানে সেখানে চলে যাওয়া ।

ময়না বলে :: আমরা সাক্সেসফুল আর বয়স্ক । আমাদের অসুবিধে কোথায় ?

ওর স্বামী সরাসরি কিছু না বললেও মনে মনে হয়ত ওদের হিংসা করে । ওদের এই ফ্রিডম্টা মেনে নিতে পারেনা । শত হলেও বাঙালি তো ! নারীদের কন্ট্রোল করার এক অদ্ভুত প্রবণতা দেখা যায় ওদের মধ্যে ।

ময়না কিন্তু এইরকম বিজ্ঞানী বিয়ে করতে চায়নি । ওর পছন্দ ছিলো ভ্লাদিমির্ পুটিনের মতন অসম্ভব ক্ষমতাধারী এক ম্যাচো পুরুষ । কিন্তু বিয়ে হল এক ইন্টেলেক্চুয়ালের সঙ্গে আর তাও ভালোবেসেই !

ময়নার মা অবাঙালী বলেই বোধহয় এক আশ্চর্য সাবলীলভাব আছে ওর মধ্যে । ও কাজ করে আর লাইফকে এনজয় করে । তবে একটু মুডিও আছে । হট্

করে কিছু একটা করে ফেলে । যেমন একদিন সারারাত ধরে ড্রাইভ করে দূরের শহরে গিয়ে একটি হাংরি জ্যাকে খেয়ে এলো । কারণ সেই রেস্তোরাঁটি নাকি এক অপরূপ গীর্জার ধারে । গথিক চার্চ । গথিক স্থাপত্যে তৈরি । আগে একটি ভাঙা গীর্জা ছিলো । পরে ওটা সংস্কার করা হয় আর তাতে গথিক আর্কিটেকচারের ছোঁয়া দেওয়া হয় । বিরাট বড় বড় চূড়া , কাঁচের জানালা , স্টেনড্ গ্লাসের নানান কারুকার্য, চিত্র আর সেইসব রঙে চার্চ ভুবন রং মাতাল ।

গথিক চার্চ যেকোনো শিল্পীর কাছেই আকর্ষণীয় । এর স্থাপত্য ও সৌন্দর্য্যের জন্য । ময়না রিলিজিয়াস ব্যাপারটা বাদ দিয়ে ওখানে স্থাপত্য দেখতে যায় ।

ও ইউনিভার্সের পূজারী । সুপ্রিম কনশাস্নেসের অর্চনা করে । আর সত্য সবসময়ই তেতো । কাল্টদের ভালোলাগবে না ওর পন্থা ও প্রথা তাই ও চার্চে যায় রঙ মাখতে । অশান্ত , অস্নাত গোধূলি বেলায় । সূর্যের শেষ আভায় গথিক চার্চ তখন পাগলপারা । একমাত্র শিল্পীরাই তা দেখতে পায় ! দুই হাতে রং কুড়িয়ে মুখে মাখে ময়না পাখি । গথিক আঙিনায় !

এই অপরাহ্নের আভায় আলাপ হল এক বৃদ্ধের সাথে । কালো কুচকুচে বরণ । মাথার চুলে বেগুনি আর হাল্কা নীলের স্তর আর সুঠাম দেহ, সীসার তৈরি যেন ।

লোকটিকে বহুবার দেখেছে । কে তা জানেনা ।

মনে হয় অ্যাফ্রিকা থেকে এসেছে ।

যখন সঙ্গীত বাজে তখন এককোণায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে । খুবই শান্ত প্রকৃতির মনে হয় । ধীর-স্থির মানুষটি ।

মাঝেমাঝে চলে যাওয়া এই চার্চে , অপরিচিত মানুষটির সাথে একদিন আলাপ করলো যেচে । **বয়স্ক ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলায় বলে ওঠেন :: হ্যাঁ , বলুন !**

চমকে ওঠে ময়না ! অ্যাফ্রিকান বাংলা বলছে তাও বিদেশে ?

--আরে আমি তো হাফ্ বাঙালি ! বলে ওঠে সহজ ভাষায় । সত্যি মানুষটিকে দেখে যতটা নীরব মনে হয় ততটা নয় আসলে ।

ময়না অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে । চুলে দুইরকম রং । ভদ্রলোকের নাম স্যাম । বলে ওঠে :: **সামনের**

সপ্তাহে দেখবেন কমলা আর রূপালি । আমি প্রতি সপ্তাহে চুলের রং বদলাই । আমার চুলকে আপনি গিরগিটি বলতে পারেন ! আর কনট্যাক্ট লেন্স বদলাই নানা রঙে । চশমা পরি না । পরতে অসুবিধে হয় ।

ময়না একটু হেসে বলে :: আমাকে আপনি করে না বলে তুমি বা তুই বলবেন । আমি অনেক ছোট ।

ভদ্রলোক খুব মজার । হেসে বলে :: সে ঠিক আছে কিন্তু আমি বয়সের অ্যাডভান্টেজ নিতে চাইনা । তবে একান্তই চাইলে তুই বলতে পারি ।

ময়না লাফিয়ে ওঠে । তুই সম্বোধনটা ঝট্ করে মানুষকে কাছে এনে দেয় । এরকমই মনে হয় ওর । তাই একপ্রকার জোর করেই স্যামকে দিয়ে তুই ডাকিয়ে নেয়!

স্যাম কিন্তু অ্যাফ্রিকান হলেও ভারতীয় । বহুবছর আগে, সুদূর অ্যাফ্রিকা থেকে ওরা স্লেভ হয়ে আসে ওদের সাহেব মালিকদের সাথে এবং দক্ষিণ ভারতের নানান স্থানে আজও বসবাস করে ।

লোকে অবশ্যি ওদের দেখে হাসে, ঢিল মারে , গালি দেয় কিন্তু নিখাদ ভারতীয় বলে ওদের গ্রহণ করতে ও কাউকে দেখেনি । পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে পাসপোর্টের নাম করে

কিছু ঘুষ নিয়ে নেয় । ওরা কেন বিদেশী হয়েও পাসপোর্ট না নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে !

লোকাল লোকেরা ওদের স্থানীয় ভাষায় কথোপকথন শুনে বলে :: **আরে বাবা এ যে দেখি ভূতের মুখে রামনাম !** একটু চটুল মানুষ বলে **:: পোদে নাই চাম্, হরেকৃষ্ণ নাম !**

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দক্ষিণীরাও ওদের নিয়ে কালো বলে হাসাহাসি করে । ওর মা আসলে বাঙালী মেয়ে । কলকাতার কাছে নৈহাটিতে ছিলো । দাদু ছিলো রেলের গার্ড । অনেক দূরদেশ ভ্রমণ করতে পারতো চাকরির কারণে । একবার দক্ষিণে গিয়ে এই কমিউনিটির কথা শোনে । ওদের লোকে **হাব্সি** বলে । কিন্তু ওরা নিগ্রো, হাব্সি ইত্যাদি বিশেষণকে অপমানজনক মনে করে । **তাই স্যামের দাদু মানে মাতামহ ওদের বলে :: মেঘ মানুষ ।**

নিজের একমাত্র মেয়ে সবিতা খুব কালো । বিয়ে দেওয়া মুস্কিল ছিলো । পাত্রপক্ষ এসে, দেখে, মিষ্টি খেয়ে চলে যেতো । পরে পোস্টকার্ডে গালাগালি দিতো মেয়ের গায়ের রং এর জন্য । লিখতো :: আমার ছেলেকে তো আল্কাতরায় চুবাই নি যে এখানে বিয়ে দেবো !

(পরের দিকে, অপমানিত হয়ে হয়ে চোখের চামড়া ক্ষয়ে যাওয়া সবিতা পাল্‌টা পত্রাঘাত করতো :: চুবালে সঙ্গে সঙ্গে জানাস্ , নেড়িকুত্তার দল !!)

তারপর পাত্রপক্ষ আরো লিখতো-- সারাদিন খেটেখুটে এসে দেখবে একটা কালো হাত চা দিচ্ছে !

অথবা আপনার মেয়ে এত কালো যে আমার ছেলে ওকে রাতের বেলায় দেখে , ভয়ে খাট থেকে পড়ে গিয়ে খাট ভেঙে ফেলবে ।

একজন এসেছিলো মেয়ে দেখতে । **চোব্যচোষ্যলেহ্যপেয়** হয়ে গেলে লোকটি অজ্ঞান হয়ে যায় । পাত্রী দেখে ।

এত্তো কালো মানুষ নাকি সে কোনোদিন দেখেনি ।

এরপর থেকে সবিতা পাত্রপক্ষকে বলতো :: দেখে নিন আমার গায়ে হাত ঘষে কোনো রং মেখে এসেছি কিনা !

ওর বাবা বলতো :: এসব বললে তোর কোনোদিনই আর বিয়ে হবেনা ।

সবিতা মুখরা ছিলো । বলতো :: বাবা, যারা এইভাবে আমাকে যাচাই করে নিয়ে যাবে তারা পরে বৌ পোড়ানো

পরিবার বলে নিন্দিত হবে । কাজেই আমার মনে হয় যতই অবাস্তব হোক্ আগে থেকে সব পরিস্কার করে নেওয়া ।

ভদ্রলোকের একটা জেদ চেপে গিয়েছিলো বোধহয় । যেমন করেই হোক্ মেয়ের ভালো বিয়ে দিতেই হবে ।তাই হয়ত এক শুভলগ্নে মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি দেয় দক্ষিণী , দ্রাবিড় রাজ্যে । যেখানে আছে হাব্‌সি বা নিগ্রো কূল, যাদের রেলের পক্‌ককেশ গার্ড বলে থাকে :: **মেঘ মানুষ ।**

আশ্চর্য কপাল গার্ডের । যেন ভগবান গার্ড দিয়ে এখানে এনেছেন ! এক পাত্রও জুটে গেলো । লোকটি বাংলায় গিয়েছিলো পড়াশোনা করতে । **আঁতেল বাঙালী ওকে গোরিলা বলে ডাকতে শুরু করে** । মিটিং মিছিলে অভ্যস্থ কলেজ পড়ুয়াগণ ওকে এমনও বলেছে :: কলেজে কী করছিস্ ? তোর জন্য আলিপুরের জু-তে একটা খাঁচা খালি আছে !

একজন আবার ওকে কেশচর্চা করতে দেখে ফেলে হোস্টেলে । ব্যস্! আর যায় কোথায় ?

--ওরে সবাই দেখে যা গোরিলা চুল আঁচড়াচ্ছে !

সবচেয়ে আহত হয়েছিলো যেদিন প্রিন্সিপ্যাল স্যার স্বয়ং ওকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন।

বলেন :: তোমরা তো সিংহ শিকারে অভ্যস্ত । তা এই কলকাতায় কেন ? সুন্দরবনের রাস্তাটা বুঝি চেনা নেই ?

এই তো আমি থু করে থুথু ফেললেই সেটা সুন্দরবনে গিয়ে পড়বে ! আমি এবার থেকে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর সময় পশু বিভাগে তোমার ফটো দেখাবো , বনমানুষের বদলে ! তোমরা আসলে হলে আরে বুঝলে না ? **মিসিং লিঙ্ক** । আমাদের মানবজাতি আর চিম্পুর মধ্যেখানে তোমরা !! বলেই হ্যা হ্যা করে হেসে উঠতো সবাই মিলে !

ও-ও কিন্তু এই বঙ্গনন্দন কে অনেক কিছু বলতে পারতো কিন্তু ওর রুচিতে বাধে । ও হয়ত বাইরে কালো কিন্তু অন্তরে নির্মল মানুষ । আর এই অধ্যাপক বাইরে পরিপাটি ও কেজো মানুষ কিন্তু অন্তরে একেবারে নোংরা জল । পরতে পরতে পলিমাটি । যেন সমুদ্রে পৌঁছে যাওয়া কোনো নদী । পলি যুক্ত , গতিহীন । আর কিছুই করার নেই তাকে নিয়ে । না শোধন না বাঁধন । যা করবে সবই হবে অরণ্যে রোদন ।

সবাই পরে চমকিত । প্রিন্সিপ্যালের এহেন নিম্নরুচির বাক্যালাপ শুনে । উনি নাকি জোক্ করছিলেন !

যেই কলেজে, প্রধাণ পরিচালকের জোক্-এর এই অবস্থা সেখানে লেখাপড়া না শেখাই বাঞ্ছনীয় ! **এরপরে প্রিন্সিপ্যালকে কেউ চড় মারলে তখন তাকে রাস্টিকেট করে দেওয়া হবে নিয়মভঙ্গের অভিযোগে।**

কাজেই ফিরে আসে দ্রাবিড় গৃহেই । লোকাল কলেজেই Arts পড়ে । এখন সবিতাকে বিয়ে করে নাকউঁচু বাঙালীকে দেখিয়ে দিতে চায় যে শুধু অমিতাভ বচ্চন নন সেও বাংলার আরেক জামাই ! বাংলার নিগ্রো জামাই !

বিয়েটা হয়ে যায় । সবিতার গার্ড পিতাও হাতে সোনার চাঁদ পায় । কারণ স্যামের বাবা, ব্যাঙ্কের অফিসার **সোলা আফ্রিম খুবই ভালোমানুষ আর কালো হলেও মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি আছে। খুবই বিনয়ী আর গভীর মানুষটি । কাজেই সবিতা ডুবে গেলো মেঘমানুষে !**

ছন্দিতা , ছন্দসী , ছন্দবাণী এখন উজ্জ্বল সবিতা !

স্যামের নামও বাবা মায়ের নামে :: আফ্রিমের অ্যা আর সবিতার স নিয়ে স্যাম ।

INFORMATION ::::

The Siddi also known as Siddhi, Sheedi, or Habshi (Kannada) are an ethnic group inhabiting India and Pakistan. Members are descended from Bantu peoples from Southeast Africa. Some were merchants, sailors, indentured servants, slaves, and mercenaries. The Siddi community is currently estimated at around 50,000–60,000 individuals, with Karnataka, Gujarat and Hyderabad in India and Makran and Karachi in Pakistan as the main population centres. Siddis are primarily Sufi Muslims, although some are Hindus and others Roman Catholic Christians. (Wikipedia)

এইভাবেই শুরু হল স্যামের পার্থিব জীবন । বাঙালী স্বাধীনচেতা মা আর নিপাট ভালোমানুষ মেঘপুরুষ বাবা । জীবন ভালই ছিলো ওদের ছোট্ট গ্রামে । কিন্তু ওরা নিজভূমে পরবাসী । সবাই ওদের বিদেশিয়া বলে সম্বোধন করতো । গোপন তথ্য দিতো না । যদি চরবৃত্তি করে !

স্যাম ও অন্যরা বলতো :: আমরা তোমাদের মতনই ১০০ ভাগ ভারতীয় ।

তখন ওরা বলতো :: তবুও, এখানে তো তোমাদের শিকড় নেই ! বংশের আরম্ভ তো সেই অ্যাফ্রিকাতে !

ইত্যাদি । স্যামের দু:খ হত । কিন্তু মানুষের ধারণা আর স্বভাব বদলানো সবচেয়ে শক্ত ।

একবার হয়ে গেলে তা থেকে বার হওয়া প্রায় অসম্ভব । যারা পারে তারা হয়ত মহামানব !

তাই স্যাম একদিন অনেক দু:খে চলে এলো ওলিম-দেশে । সেও এক গল্প । বিশাল সেই কাহিনীর বপু !

হিউজ ফ্লেশ্ তাতে ! গল্প মানে জীবনীতে ।

স্যামের বাবা তো শিক্ষিত ছিলো । কাজেই ইংরেজি পারতো । ভদ্রলোক আবার দক্ষিণী ক্ল্যাসিকাল গান শিখেছিলো । পরে ইংলিশে গান লিখে তাতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর দিয়ে গাইতো সবাই মিলে । ছোট ছোট গান । ভগবান যীশুকে নিয়ে খ্রীস্টমাসের সময় গাইতো । সেই ইংলিশে লেখা , স্বরচিত গান । সুরটা কোনো রাগের ওপরে দাঁড়িয়ে । একদম নির্ভেজাল ক্ল্যাসিকাল গান । বন্দীশ্ ।

---টুডে ইজ খ্রীস্টমাস্ টাইম----উই আর সিঙ্গিং অ্যান্ড ড্রিকিং ডিভাইন ওয়াইন ----আ আ আ আ আ, ও ও ও ও ও --রে রে রে গা গা গা মা মা পা পা !!!

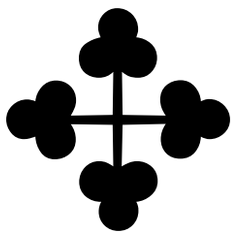

Information :: IndiaToday.in

Musician Kiran Phatak

This man sings classical Indian ragas in English !!!

That's right. Musician Kiran Phatak is of the belief that art should be ever-evolving, and has thus translated a number of classical Indian ragas to English, for the world to understand India's music.

সেই সঙ্গীতের সুত্রেই বিদেশে আসা !

গীর্জায় ; ইংলিশে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধুর্য্য নিতে অনেকেই আগ্রহী । যীশু ঠাকুরের অর্চনাতে সেই গান বাজানো হবে । ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত খুবই উচ্চমানের । জগৎ জোড়া নাম তার । কাজেই প্রাচ্যের এই অভিনব **তাল সুর লয়** দিয়ে নেচে উঠবে অর্গ্যান !

হয়ত সেইকারণেই মুখ তুলে চাইলেন যীশু । এবং বিদেশে আসে স্যাম- গানের জন্য । গান গাইতে ।

আসরের শেষে নিয়ম মাফিক সবাই ফিরে যায় । কিন্তু ফেরেনা একমাত্র স্যাম । **মেঘ মানুষের আড্ডায় ।**

থেকে যায় এই পরবাসে । চিরতরে ।

আইনতঃ তো থাকার উপায় নেই । কাজেই ঘন বনে বহুদিন লুকিয়ে ছিলো । এক মেষপালক ওকে আশ্রয় দিয়েছিলো । দিনের বেলায় পশুপালন করতো । ভ্যাড়া চড়াতো । রাত্রে ঐ মেষপালকের ডেরায় শুতো ।

তার একমাত্র মেয়ে থাকতো ঘর জুড়ে । দিনের বেলায় সেই সব কাজ করতো ও রন্ধনে নিযুক্ত হতো ।

স্যুপ, মাংসের রোস্ট, আলু ও কফি সেদ্ধ আর ব্রেড । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই খেতো ওরা । সস্তার বাজারে পায়ে হেঁটে যেতো । সবাই মিলে বাজার করে ফিরতো । ভ্যাড়ার পাল থাকতো ওদের ছোট্ট কুটিরের পেছনে লাগোয়া সবুজ মাঠে । উন্মুক্ত মরা ক্ষেত আসলে । সবুজ ঘাসের গালিচা আর দূরে পাহাড়ের সারি ।

বেগুনি, মেটে, নীল, ধূসর আর গাঢ় সবুজ সমস্ত পাহাড়ের সারি । দেখলেই মনটা ভালো হয়ে যায় ।

মেষপালক আসলে অ্যাফ্রিকান । এক দক্ষিণ অ্যাফ্রিকার সাহেবের সঙ্গে এইদেশে আসে । সাহেব একটি ফার্ম কিনে সেখানে থাকতো । পরে অন্যদেশে চলে গেছে । ফেরার সময় চাকর আর সঙ্গে যায়নি । এখানেই সাহেবের গুটিকতক ভ্যাড়া আর অল্প জমি সম্বল করে বেঁচে আছে । চাকরাণী টিফানিকে বিয়ে করে । ওদের মেয়ে এখন যুবতী । নাম আলিশা ।

টিফানি মারা গেছে বিষাক্ত সাপের কামড়ে । এখন বাপ্ ও আলিশা আছে । সেখানেই প্রথমে ঘাঁটি গাড়ে স্যাম ।

আলিশাকে স্যাম ডাকে হেস্টার বলে । ওকে ইম্প্রেস করার জন্য, স্যাম খালি গায়ে রোদের মধ্যে দিনের পর দিন মাঠে শুয়ে থাকতো । পেশীবহুল দেহ স্যামের সেই সময় । অনেক নারীই মজে যাবে !

হেস্টার মেয়েটি সহজ সরল । একদিন এসে বলে :: আমাকে দেখানোর জন্য এইভাবে শোও তো ? তা আমি তোমাকেই মন দিয়েছি । আর এইভাবে কড়া রোদে শুতে হবেনা । আরো কালো হয়ে যাবে তুমি !

তুমি এত শক্তপোক্ত , ক্ষমতাশীল -আমাকে সবসময় রক্ষা করবে তো ?

আসলে ওর বাবা একদিন স্যামকে বলে :: নিজের পাত্রী নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে নাহলে সারাজীবন একাকীত্বে ভুগবে । এই দেশে এটাই নিয়ম !

তখন হেস্টার বা আলিশা আবার ওখানে ছিলো । কাঁচি দিয়ে পালং শাক কাটছিলো । হয়ত সেইকারণে এসে নিজেই প্রস্তাব দিচ্ছে । আর মেয়েই বা কোথায় এই বনান্তে? ঐ হেস্টারই সম্বল । তবে মেয়েটি ভালো ।

সকালে সবজি কেটে , মাংস ধুয়ে রান্না করতো । দিনের বেলায় স্যামের সাথে মেষপালন করার নামে সময় কাটাতো । ওর বাবা আবার কিছু ফসল ফলাতো । আগে নিজের ইচ্ছে মতন ফসল ফলালেও পরে ক্যাশ ক্রপ এর চাষ হত । কিছু ফার্মার্স মার্কেটে বিক্রি করতো । সেখানেও স্যাম সঙ্গে যেতো । **এইভাবেই মেঘ মানুষ হয়ে ওঠে মেষ মানুষ । আর শুভদিনে হেস্টারের সাথে লোকাল চার্চে বিবাহ সারে ।**

ঐ গীর্জায় পরে স্যাম ইংলিশে খেয়াল গাইতো । লোকে খুব বাহা বাহা করতো , ধন্য ধন্য করতো ।

প্রতিটি বন্দীশ্ তারিফ পেতো ।

একটি ভ্যাড়া একবার কোথায় হারিয়ে যায় । বহুদিন পরে ওকে খুঁজে পায় স্যাম । এক গুহায় বসে ছিলো ।

তার দেহে এত লোম গজিয়ে গেছে যে নড়তে অক্ষম । প্রাণসংশয় দেখা দিয়েছে প্রায় !

ওকে কোলে করে নিয়ে আসে স্যাম গাইতে গাইতে : :

ও শিপ্ ইউ আর আ হিপ্ অফ্ উল্ ;

তা না না রে না রে না রে না না , তা না না রে না রে না !

ইউ আর ফুল, ফুল অফ উল্ , ও পুওর শিপ্

ইউ লুক্ লাইক আ বুল্ , আ আ আ আ , তা না না রে রে !!

হেস্টার ওরফে আলিশাকে বিয়ে করে স্যাম এই দেশের পার্মানেন্ট সিটিজেন হয়ে ওঠে । এই ওলিম দেশে এইরকমই নিয়ম ।

আর মেষপালনের সাথে সাথে চলে চার্চে সঙ্গীত সাধনা । অর্গ্যানের কাছেই বসতো নিজ হারমোনিয়াম নিয়ে । তারপর চলতো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ইংলিশে । বন্দীশ্ ।

হংসধ্বনি , মারোয়া , খাম্বাজ ---মেঘমানুষের মনে মেঘ মল্লার ।

এইভাবেই ছিলো বেশ । কিন্তু একদিন হেস্টার ওকে ত্যাগ করে চলে যায় । ওর বাবা খুবই দু:খ করছিলো এইজন্য । কিন্তু মেয়ে অন্য লোকের সাথে চলে গেছে । **মেঘমানুষের হৃদয়ে আজ সত্যি মেঘের আনাগোনা ।**

এরমধ্যে শুরু হল যুদ্ধ । ওলিম দেশ আর আরেক অ্যাফ্রিকান দেশের । ব্যস্ । ওদের বন্দী করে নিয়ে গেলো সরকার । হেস্টারের বাবা নাহয় অ্যাফ্রিকান । কিন্তু স্যাম তো ভারতীয় ! তার পাসপোর্ট ভারতীয় ছিলো আর সে আগে ছিলো তো ভারতের নাগরিক । কাজেই তাকে ধরে নিয়ে যাবার কোন কারণ নেই

কেবল গায়ের বরণ এর জন্য দায়ী । ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখে আর কুঞ্চিত কেশ ও মুখের গড়ণ ; সরকার পক্ষ ওদের অ্যাফ্রিকান মনে করে । তাই সোজা এক নির্জন কেল্লায় ওরা ঠাঁই পায় । মধ্যযুগীয় কেল্লা । যেখানে না ঢোকে আলো, না বাতাস । স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর সমস্ত । এক একটা ঘরে অনেক অনেক মানুষ বন্দী । কোনো টয়লেট নেই । সেই ঘরেই ওরা থাকে, টয়লেট করে ও খায় । রাতে অভুক্ত ইঁদুর এসে ওদের মাংস খুবলে খেতো । পচা জমা জল ও মলমুত্রতে ঘরে নাভিঃশ্বাস ওঠে । তারই মধ্যে ওরা ছিলো । অনেক মানুষ তো মরেও গেলো সেখানে ।

ওর শ্বশুর মহাশয় ওখানেই দেহ রাখে । তবে স্যামের কপাল ভালো । স্যামের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কল্যাণে এক অফিসারের নেক নজরে পড়ে । ভদ্রলোক নিয়মিত গীর্জায় যেতেন বলে যীশু প্রেমী ছিলেন ।

গান ; গুনগুন করে গাইতো স্যাম । অন্ধকার ঘরে বসে । পচা গন্ধে আসতো সুগন্ধ । রাতের রজনীগন্ধার গুঁতোয় অফিসারের নজরে পরে যাওয়াতে ওকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান অফিসার কিন্তু বলেন যে এখন আবহাওয়া গরম । কিছুদিন গা ঢাকা দিতে হবে । পরে চার্চে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে ।

তখনই স্যাম প্রথম নারী সেজে নাটকে অভিনয় শুরু করে । ছোট ছোট নাটকের দল ছিলো কান্ট্রি অঞ্চলে । অনেক সময় সেখানে মেয়েদের রোল পুরুষেরা করতো কারণ মলেস্টেশানের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছিলো তাই দলে মেয়ে নেওয়া বন্ধ হয়ে যায় ।

স্যাম তখন চোখ মুখ এঁকে , ফল্‌স্‌ বক্ষ বেঁধে , লম্বা চুল বানিয়ে তাতে ক্লিপ লাগিয়ে নিয়মিত সব মেয়েলি রোল করতো ।

নিজের চওড়া বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে ::**এই এইখানে , ঠিক এইখানে ঐ বলগুলো লাগাতাম , মাথায় পনিটেল করতাম , কানে লম্বা ঝোলানো দুল । উহ্‌ ! কী যে অবস্থা তখন !**

মেয়েদের নিয়ে আয়েষ করতে চাইতাম , ওদের শরীরের খাঁজে আর ভাঁজে হাত বোলাতে ইচ্ছুক ছিলাম । ওদের সঙ্গে শুতে আগ্রহী যে তাকে নিজেকে রোজ মেয়ে সেজে পার্ট করতে হচ্ছে । এ কেমন বিচার যীশু খ্রীস্টের ? বল দেখি ? তাও ভাগ্য ভালো কেবল ওপরে যা হয়েছে হয়েছে , নিচে কোনো চেঞ্জ আসেনি । আজকালকার যুগ হলে হয়ত অপারেশান করে দিতো - কে জানে !

মেঘ মানুষের মুখে শ্রাবণের মেঘ । আর তারপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি । সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে চলে গেলো ময়না অন্যভুবনে । সেখানে রাজা ওর স্বামী ।

যার সাথে ওর ডাইভোর্সের কেস চলেছে ।

ওর পন্ডিত স্বামী ওর খরুচে স্বভাব, ওর অভিজাত লাইফ স্টাইল ওর অত্যন্ত দামী যানবাহনের নেশা আর রেড ও পোর্ট ওয়াইনের নেশারু আঁখিকে ঘৃণা করে ।

ভদ্রলোকের মতে **প্লেন লিভিং আর হাই থিংকিং** হল সর্বসেরা । যারা তা করেনা তারা মূর্খ । স্বার্থপর । নির্মম । দুনিয়াতে কোটি কোটি মানুষ ভুখা নাঙ্গা রয়েছে আর ওরা এইভাবে বাজে খরচ করে জীবন কাটাচ্ছে । আকাশচুম্বি ওদের খরচ । যাপন । যদি ময়না মাটিতে না নামে তাহলে বিজ্ঞানী ওকে বিচ্ছেদের গুঁতো দেবে । ময়নার ; অত্যন্ত বেশি খাবার সময় যখন চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে তখন হজমি গুলি খেয়েও খানাপিনা চালায় । কতগুলি অভুক্ত মুখ ওর মনে পড়েনা ?

ময়না ভাবে :: ডোনেট তো ও করেই তবুও নিজে ভোগ করতে পারবে না ? নিজের পরিশ্রমের পয়সা, মোটা আয়কর দেয় । আবার কী চায় এরা ? আর দুজনের জীবনদর্শন ভিন্ন হলেই কী বিচ্ছেদে যেতে হবে

? ওদের বেঁধেছিলো প্রেম । একান্ত আপন , গোপন মধুর প্রেম । আজ মধ্যবয়সে এসে হিসাব বদলে গেলো ? যে যার ফিলোসফি নিয়ে থাকুক তাতে ভালোবাসার কী যায় আসে ? প্রেম তো আন্‌কন্ডিশনাল !

পরস্পরের বিরোধী হলেও মানুষ এক ছাদের নিচে থাকতে সক্ষম । আগে আমরা মানুষ তারপর বিলিফ্, ফিলোসফি আর লজিক । ময়নার এরকমই মনে হয় ।

ওর বাবা তো কত সব সমাজ সেবা করতেন । মা মোটেই বরদাস্ত করতেন না । মা তো নয়না রাণা । বাঙালী নন । তবুও বাবাকে ছেড়ে যাননি ।

বাড়িতে বাউল আসতো বীরভূম থেকে । কমোড ব্যবহার করতে জানতো না । মাটিতে নিজেদের কম্মো সেরে ফেলতো । পরে মাকে সেইসব বিষ্ঠা সাফ করতে হয়েছে । বহুবার । পটুয়ারা আসতো । অনেকেই ওরকম করতো । ওরা গ্রামীণ মানুষ , সবুজ মানুষ । ওরা অতশত জানেনা । তবুও মা কিন্তু বাবাকে ত্যাগ করেন নি । ওদের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স এসেছে তবুও ওরা আলাদা পথে চলে যাননি ।

ওর স্বামী সেটা কেন বোঝেনা ? কেন তার মনে হয় যে যারা ভোগ করতে অভ্যস্থ তারা সবাই অমানুষ ?

বিজ্ঞানীদের গবেষণার টাকা কোথার থেকে আসে ??

স্যামের বৃষ্টির হাত ধরে ময়না ভেসে গেলো অন্য এক মরুভূমে । যার নাম ওর হৃদয় । সেখানে এক ফোঁটা বৃষ্টিও আজ প্রবল বর্ষণ আনতে পারে !

ময়নার স্বামী মৈনাক তো পন্ডিত । সমাজে একটা পরিচিতি ও সম্মান আছে তার । তাই হয়ত প্রস্তাব দেয় যে লোকসমাজে ওরা স্বামী ও স্ত্রী সেজে থাকবে কিন্তু এমনিতে আলাদাভাবে বসবাস করবে ।

ময়না এককথায় তা নাকচ করে দেয় । ও বলে :: আমি যদি তোমাকে নিজের পার্টনার হিসেবে না দেখি তাহলে একসাথে থাকার কোনো মানে হয়না । লোকে কী বলবে, ভাববে তাই নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই । কিন্তু এইভাবে দিনের পর দিন আমি নিজেকে ঠকাতে পারবো না । আমি নিজের জন্য বাঁচি । অন্যকে খুশি করার জন্য আমার জীবন নয় ।

যেখানে কোনোরকম সহানুভূতি ও ভালোবাসা আর বেঁচে নেই সেখানে শুধু একটু সিঁদুরের ছোঁয়া দিয়ে আমাদের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার কোনো কারণ আমি দেখছি না । পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যেখানে মরে গেছে সেখানে লোক দেখানি আচার বিচার করতে আমি পারবো না । আমাদের দুজনের, নিজেদের রাস্তা বেছে নিয়ে সুস্থভাবে সেইদিকে চলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কথাগুলো বলতে খুবই কষ্ট হয়েছে ময়নার কিন্তু এটাই আজ চূড়ান্ত বাস্তব । কেন সুন্দর সম্পর্কগুলো তেতো হয়ে যায় ,কেন মানুষ পরম বিশ্বাসভাজনের বিরোধিতা করে আর কেনই বা দুটি মানুষ একদিন পৃথক হয়ে যায়, একই গাছের দুই ডালের মতন তা ময়না জানেনা । কোনসময় হয়ত এগুলি নিয়ে আলোচনা করবে , গবেষণা করে একটা বই লিখবে ।

তাও ছেলেপুলে থাকলে হয়ত ক্ষীণ যোগাযোগ থাকে । ওদের তো তাও নেই !

এই মূহুর্তে আর কোনো নতুন সম্পর্কে যেতে ইচ্ছুক নয় ময়না একেবারেই । বান্ধবীকূল আর নিজের কাজ নিয়ে কেটে যাবে সময় । অন্ধকার ঘরে একা বসে বসে মনটা শান্ত করার চেষ্টা করে ময়না । ধ্যান করে । এতে মনের নেগেটিভিটি কমে যায় । আর সবসময় পজিটিভ চিন্তা করে । জীবনে যা পেয়েছে তার হিসেব করে , খুশি হয় ভেবে । **যা পেলোনা তাই নিয়ে মনে কোনো অশান্তি রাখেনা** । মনে করে যে ওসব অভিজ্ঞতা আমার করার দরকার নেই ,আমার জন্য নয় । সবার সব অভিজ্ঞতা হয়না , হবার প্রয়োজনও নেই । নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও পজিটিভ একটা তরঙ্গ চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া - এই ফিলোসফি নিয়ে বাঁচাই সবচেয়ে ভালো । ওর এক বান্ধবীর স্বামী ছিলেন

প্লেয়ার । **Skateboarding করতেন । তাতে কোমড় ভেঙে যায় । শিরদাঁড়ায় অপারেশান করলে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে পড়েন । কিন্তু জীবনকে পজিটিভ দিক্ থেকে দেখা এই মানুষ বাকি সময়টা এইসব স্পোর্টস নিয়ে লিখে, গবেষণা করে ও আহত প্লেয়ারদের জন্য ফান্ড যোগাড় করে কাটান ।**

বলেন :: এও এক অভিজ্ঞতা । লাইফ আমার দিকে যা থ্রো করে আমি অ্যাকসেপ্ট করে এগিয়ে যাই ।

লিভ লাইফ ফিয়ারলেস্লি । আমি তো ক্লক্কে রিভার্স করতে অক্ষম । কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ এগুলি নিয়ে হা হুতাশ না করে এর থেকে শিক্ষনীয় জিনিসগুলি বার করে নিয়ে স্ট্রং হয়ে এগিয়ে যাওয়া । সবসময় মনে রাখতে হবে যে দূর্ভাগ্য আমাদের পরিণত করে ।

কষ্টের পরেই আছে অনাবিল আনন্দ ।

কাজেই ময়নাও সেটাই করে থাকে ।

স্যামের রাত্রে ঘুম আসেনা বলে ও চার্চে থাকে । পাহারা দেয় । গার্ড হয়ে । দাদু ছিলো রেলের গার্ড আর ও চার্চের গার্ড ।

মানুষকে একটি করে গাছের চারা দেয় স্যাম ।

বলে :: যীশুকে ভালোবাসলে গাছ লাগাও ।

আজকের চারাগাছ কাল তোমার সন্তানকে শীতল ছায়া দেবে !

এইভাবে বহু পরিচিত ও অপরিচিত মানুষ, যারা নিয়মিত চার্চে আসে তাদের গাছ লাগাতে প্রেরণা দেয় স্যাম ।

বলে :: আমরা ভারতে তো একঘরে হয়ে ছিলাম । কিন্তু এখানে এসে সেসব বলিনা । বলি যে আমরা ভালই ছিলাম শুধু এখানে অনেক বেশি স্কোপ বলেই এসেছি । আরো সমৃদ্ধ দেশ আর সমাজ তাই জন্য এলাম । নিজের দেশের নিন্দা করিনা । মাতৃভূমি আমাদের যতই বিমাতার মতন দেখুক ।

এইজন্যই হয়ত বলে :: **কুপুত্র যদিবা হয় কুমাতা কদাচ নয় !!**

এখন স্যাম স্টেনড্ গ্লাসের কাজ শিখে নিয়েছে । রং বোলানো প্রতিটি প্রহরে। দিনের বেলায় সেই কাজ করে । ডিজাইন বানায় নানান । রাত্রে চার্চেই শোয় । ওর কোনো ঘরবাড়ি নেই । ও করতেও চায়না । বলে :: আবার তুলে নিয়ে যাবে কোনো জেলে , কোনো ছুঁতোয় । আসলে অ্যাফ্রিকার মানুষ কপাল দোষে ভারতে । সেখানে বংশ পরম্পরায় বাস । নিজেদের ভারতীয় ভাবা । কিন্তু লোকাল মানুষ আমাদের কোণঠাসা করে রেখেছে । এখানে এসেও একই ব্যাপার । আমরা কালো বলেই কী ভূত আমাদের ছাড়ে না ?

কোনো না কোনো ভূতের খপ্পরে সবসময় আমরা পড়ে যাই । রং ভূত , জাত ভূত, দেশদ্রোহী ভূত আবার ভাষা ভূত । কাজেই নতুন বাসা ফেঁদে আমি আর অন্য কোনো ভূতের কবলে পড়তে চাইনা । এই চার্চই আমার ঘরবাড়ি । আমাকে আশ্রয় দিয়েছে । ঐ অর্গ্যান আর ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের সুর আমাকে বেঁচে থাকার রসদ যোগায় । আমাকে মোটিভেট করে বেঁচে থাকার জন্য । **অঙ্কনে সে সবসময় চড়া রং ব্যবহার করে । ধূসর বর্ণ ওর একদম পছন্দ না ।** বলে :: মন মরে

যায় ! এমনিতেই এত দু:খ আমাদের আর ম্যাড়ম্যাড়ে রং ভালোলাগে না । উজ্জ্বল আভাই ঠিক আছে । আমি রং এ বাঁচি তো তাই । আমি রং এর গন্ধ পাই । লাল নীল হলুদ গন্ধ । আর জানিস্ তো আমি সপ্তাহের প্রতিটি দিন ছবিতে দেখি । রবিবার মানে সাদা রূপার পাত , সোমবার হলুদ বা সোনালী পাত । মঙ্গলবার গোলাপী আর হলুদ কালো দিয়ে আঁকা মানুষের ছবি । শুক্রবার বৃষ্টির ফোঁটার মতন এইরকম । তুইও কি এরকম দেখিস্ ?

ময়না বলে ওঠে :: একেবারেই নাহ্ ! আমার সমস্ত দিন আসে এক একটি বড় খাঁচার মতন । আপাতত: আমি এই খাঁচা থেকে বার হতে চাই । মুক্ত আকাশ আর পূর্ণজীবন এই আমার কাম্য ।

মানুষের ফ্রিডম্ ছিনিয়ে নেওয়া সবচেয়ে বড় অপরাধ । আমি বর্তমানে আমার ফ্রিডমের জন্য লড়াই করছি । আমার জীবন একান্তই আমার । আমি ঠিক করবো কীভাবে আমি তা কাটাবো । যদি অন্যায় না করি তাহলে অন্যকারোর অধিকার নেই আমাকে ডিক্টেট করার । এই গথিক চার্চটায় এলে আমার মন ভালো হয়ে যায় । যীশুর চেয়েও তোমার গান আর চার্চের সৌন্দর্য্যে মেতে উঠে ।

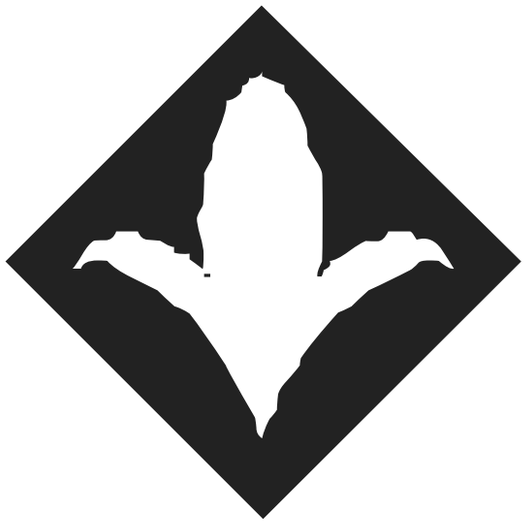

স্যামের তো কোনো নিজ বাসা নেই । কুটিরও নেই একখানা । গীর্জাই ওর ঘরবাড়ি ।

ও এমন কোথাও বাসা বানাতে চায় যেখানে কেউ কারো গায়ের রং , জাত এসব দেখে মানুষের বিচার করেনা । সেইদেশে নাকি সবাই **স্বচ্ছ মানুষ** । ট্রান্সপারেন্ট । কারোর কোনো রং নেই । সবাই সবার মন দেখতে পায় আর তাই দিয়েই মানুষ সম্মানিত বা নিন্দিত হয় । সেইদেশে ও একটা নিজ কোণ খুঁজে নিতে চায় । সেখানে স্যাম কখনও যায়নি কিন্তু যাবার প্রবল ইচ্ছে । যেতে চায় সেখানে । উড়ে উড়ে । পাখির মতন । ডানায় হিম মেখে । মেঘ হিম । মেঘ মানুষের ডানায় মেঘদূতের আহ্বান । মেঘের দেশে যেতে চায় সে । কিন্তু কবে যাবে কেউ জানেনা ।

রংবিহীন সেইদেশে সবাই কী খুব সুখে আছে ? কে জানে ! ওরকম মনে হয় দূর থেকে । কাছে গেলেই নানান রং চটা জিনিস দেখা যায় ।

তবুও মেঘদূত এসে বলে যায় ওখানে সবাই স্বচ্ছ , কাঁচের মতন । মেঘনীল কেউ নয় ! একজনও ।

ময়নার বাড়িটা সে স্যামকে দান করে দিয়ে গেলো । সম্পর্কটা আর টিঁকলো না তো মৈনাকের সাথে ।

মৈনাক একরোখা । তাই এতবছরের বিয়ে ভেঙে দিলো । ময়নার বিয়ের সময় বন্ধুরা বলতো :: তোদের এই মিলন জন্ম জন্মান্তরের । নামটা কবিত্বে মোড়া , ময়না মৈনাক । **ময় আর মৈ** । নামেই যেই জুটির ছন্দবাণী তাদের কোনোদিনই ছিন্নবীণা হবেনা । তোরা উত্তম সুচিত্রা , রাজ কাপুর নার্গিস , দিলীপ কুমার মধুবালা জুটি । পিওর লাভ , আন-অ্যালয়েড ব্লিস দিয়ে মোড়া তোদের দাম্পত্য জীবন --unalloyed delight···

বন্ধুদের শুভেচ্ছা , কথা কিছুই মিললো না তো !

ময়নাকেই রাখলো না মৈনাক তো আন-অ্যালয়েড ব্লিস আর পিওর লাভের সৈকত !

দেশে ফেরার আগেই স্যামকে বাড়ির চাবি দিলো । বললো :: মনে রেখো একজন ভারতীয় তোমায় বন্ধু বলেছে । তোমায় অ্যাডমায়ার করে , তারই ক্ষুদ্র

উপহার এই উষ্ণতা । শুধু তোমার জন্য । সব ভারতীয় হয়ত মন্দ নয় । ভালো খারাপ সবার মধ্যেই আছে । তুমি দুর্ভাগা যে রাইট লোকের সাথে তোমার পরিচয় হয়নি । আমার শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্বের মায়ায় জড়ানো এই বাড়ি ; তাই তুমি কাল থেকে এখানেই থাকবে ।

আর যেরকম মানুষের কথা বলছিলে সেই স্বচ্ছ মানুষ আমার বাড়িতেই আছে । ওদের সন্ধানে তুমি দিন কাটাচ্ছো তো ? দেখবে ওরা তোমার চারপাশেই আছে । আমার একটি বিরাট স্টুডিও আছে । সেখানে তুমি রঙীন কাঁচকে শৈল্পিক করবে । দূরে সাগরের লহরী । তাতে ডুব দিয়ে তুমি মন্থন করবে তোমার আকরিক সত্ত্বাকে ।

স্যাম রাজি হয়নি অন্যের বাসায় গিয়ে থাকতে ।

মুখে অবশ্য বলে :: আমার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে রে !!

ভ্রূ-পল্লবে ঝিলিক এনে , ময়না পাল্টা হাসি দিয়ে বলে ওঠে :: **তাতে কী হয়েছে ? তোমার গায়ে কি শীলমোহর লাগানো আছে যাতে তোমার এক্সপায়ারি ডেট্ লিখে দিয়েছেন ওপরওয়ালা ?**

সত্যি বাড়িটি খুব সুন্দর । বিশাল সৈকত আর পেছনে গভীর বনের হাতছানি । মেটে রং এর বাড়ি । পাথরের গঠণ । মানাইসই সিঁড়ি । বেসমেন্ট । পুরু কার্পেটে মোড়া মেঝে । সি গ্রিন আর ক্রিমের মতন গোলাপিতে সাজানো অন্দরের সব কিছু । বিরাট স্টুডিও । দাঁড়িয়ে আছে এককোণায় । আকৃতি একটি শঙ্খের মতন । আর আছে একটি ছবিঘর । সেখানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অনেক কিছু দেখা যায় ।

3D hologram (three dimensional , Fairy lights) প্রযুক্তি দিয়ে সৃষ্ট এইসব মানুষকে ছোঁয়া যায় । তারা বাস্তবে নেমে আসে । মনে হয় যেন আমারই চারপাশে তাদের বসবাস ।

জাপানি গবেষকদের কারসাজিতে পাওয়া ; এই অভিনব প্রযুক্তির সাহায্যে, ময়নার স্বামী মৈনাক বাড়িতে বসেই স্পেসের নানান কাজ করতো । বিচ্ছেদের সময় এই স্টুডিওটা আর ফেরৎ নেয়নি মৈনাক । হয়ত ময়নাকে একদিন ভালোবাসতো সেই সত্যের একটুকু ছোঁয়াকে বাঁচিয়ে রাখতেই ।

স্টুডিওটা নড়ানো যায় । অনেকটা গাড়িতে অ্যাটাচ করা ক্যারাভানের মতন । পোর্টেবেল স্টুডিও । তাই ইচ্ছে করলে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে সক্ষম ছিলো মৈনাক । কিন্তু এই একটি বস্তু রেখে গেছে ।

ময়না , বাড়ি সমেৎ এই অসাধারণ ঘরটি দিয়ে গেলো স্যামকে । সেখানে বসেই স্যাম দেখতে পাচ্ছে স্বচ্ছ সব মানুষদের । তারা ওর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আলোকতন্তুর মানুষ ওরা । কোনো কল্পবিজ্ঞান নয় । মায়া নয় । নয় কোনো ম্যাজিক । একদম বাস্তব ।

আদতে অ্যানিমেটেড্ চরিত্র সমস্ত ।।

শালগ্রাম শিলার চমৎকার নয় স্রেফ **hologram** এই রিয়েলিটির উৎস । বেচারা স্যাম অত বোঝে না । বুড়োমানুষ , লেটেস্ট প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় । শিল্পী মানুষ তাই হয়ত একটু বেশি আবেগপ্রবণ । **অসম্ভব খুশি স্বচ্ছ মানুষ দেখে** । সারল্যে ভরপুর ওর দুই চোখ । হাসিতে উপচে পড়ছে সীসার মতন চোয়াল পেয়ালা । অসম্ভব চকচকে ওর কৃষ্ণ কালো মুখ ।

ও ভীষণ খুশি । কেউ যে এরকম দেশে ওকে নিয়ে যেতে পারে, তাও চিরটাকাল ওদের কোণঠাসা করা এক আজব ভারতীয় , তা ওর ধারণারও বাইরে ।

জীবনে অনেক কিছু দেখেছে । দেখেছে ওর মাতামহের মতন সাহসী মানুষ , মায়ের মতন ঋজু এক বাঙালি নারী , ওর শ্বশুরমশাইয়ের মতন সৎ ও উপকারী চেতনা, এক সংবেদনশীল প্রিজন অফিসার যিনি ওর গান শুনে ওকে মুক্তি দিয়েছেন, গীর্জার পাদ্রী - যাঁর সংস্পর্শে এসে পেয়েছে অঢেল স্বাধীনতা আর অজস্র সম্মান আর একেবারে শেষে ময়নার মতন ভারতীয় বান্ধবী । যে এত স্বল্প দিনের পরিচয়ে তার মতন এক পথভোলা , আশ্রয়হীন মানুষের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছে শুধু তার অনবদ্য বাড়িটিই নয় , এক অপরূপ স্বপ্ন । স্বপ্নের দেশ , যেখানে মানুষ স্বচ্ছ , রঙহীন ।

যাদের মন দেখা যায় । তারা অপরাধ ও অন্যায় গোপন করতে অক্ষম । শরীর কাঁচের মতন বলেই মন দেখা যায় । মনের স্ক্রিনে ফুটে ওঠে প্রতিবিম্ব । সেই চিত্র বলে দেয় কে কেমন মানুষ । **গাত্রবর্ণ আর চেহারা কিংবা জাত ও ধর্ম দিয়ে ঢাকা যায়না অসভ্যতা ।**

ভয়াবহ সব মানসিক বিকৃতি । যা মানুষ ঢেকে রাখে আভিজাত্য , রূপ আর মাংস দিয়ে ।

এখানে সবাই খোলাখুলি বাঁচে । আর এই জগৎটাই ও চেয়েছিলো ।

এবার এখানে শুরু হবে জীবন যাপন ।

রং মশালের দেশ থেকে সভ্যতার দিকে পা বাড়িয়েছে স্যাম । চিরশান্তির আশায় ।

সারাটা জীবন আমরা সবাই শান্তি খুঁজে চলি । প্রকৃত শান্তি হয়ত এই জগতেই আছে যেখানে মানুষ ট্রান্সপারেন্ট । এমনই মনে করে ইংলিশে হিন্দুস্থানি রাগসঙ্গীত গাওয়া আর স্টেনড্ গ্লাসের রূপকার -স্যাম । যার এতদিন পর্যন্ত নিজ নিকেতন ছিলো যীশুভবন আর অজস্র ম্যাপেল পাতার স্তুপ ।

আজ মচ্‌মচ্ শব্দতরঙ্গ তুলে, ঝরাপাতার ওপর দিয়ে আর হাঁটেনা । আজ তার পদচিহ্ন পড়ে নির্জন সৈকতে । সোনালী বালিতে । কিছু লাল কাঁকড়া , শুকনো ঝাউপাতা , অসংখ্য শাঁখ আর সাদা ফেনা তার সাথী ।

দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনটা তবুও একটু দু:খী হয়ে যায় । ময়নার কথা ভেবে । ওকে এইদেশে থেকে যেতে বলেছিলো স্যাম । ও রাজি হয়নি ।

এখানে নাকি চারিপাশে মৈনাকের স্পর্শ । বাড়ির পেছনের প্রাইভেট বিচে বহুবার মিলিত হয়েছে ওরা । চাঁদ মেখে । চাঁদটা সেদিন সাগরের বুকে নেমে এসেছিলো । মৈথুন লগ্ন শেষে উড়ে যাওয়া হংস মিথুনে ডুবে যেতো ওরা । সমুদ্র স্নান করে নিতো ।

আজ ও একা , এই প্রাইভেট বিচে । মৈনাক আর আসবে না । কোনোদিনও । আর ও একাকীত্বের কবলে পড়ে দিশেহারা । তাই দেশটাই ছেড়ে চলে গেলো । ওর বান্ধবীরা কিংবা নতুন বন্ধু স্যাম ওকে আটকাতে পারলো না ।

মানুষ তো ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে বাঁচে ! কেউ কি কখনো মন কে দেখেছে ? স্বপ্ন ছুঁয়েছে ? নাকি হৃদয় খুলে কেউ কাউকে দেখাতে পেরেছে যে অন্যকে কতটা ভালোবাসে , স্নেহ করে ? আমাদের জীবন তো ভার্চুয়ালই । কেবল স্যামের কাছে এখন তা রিয়ল ।

কিছু ইন্টেলেকচুয়ালের সৃষ্ট বিশেষ যন্ত্র ও **femtosecond laser** এর জন্য ।

ময়নাকে একবার মৈনাক বলেছিলো :: কেন তোমরা ভাবো যে আমরা সায়েন্টিস্টরা কেবল নিউক্লিয়ার বম্ব বানিয়ে মানুষের ক্ষতি করি ? কেন ভাবো যে আমরা নিজেদের ইগো স্যাটিস্‌ফাই করার জন্য ক্লোনিং এর কথা ভাবি ? জগতের সমস্ত সাবজেক্ট গিয়ে মেশে ফিলোসফিতে । আর আমরাও লোকের ভালোর জন্যই কাজ করি । এন্ড অফ্ দা ডে সায়েন্টিস্টরাও তো মানুষ সেটা কেন ভুলে যাও ??

স্যামকে বাড়িটা লিখে দেবার সময় এগুলো মনে হচ্ছিলো । আরো বেশি করে মনে হল ওকে খুশি ও আনন্দিত দেখে । চমৎকারের স্পর্শে । জাদু নয় সায়েন্সের পরশে ।

তবুও মৈনাক আর কোনোদিনই ফিরবে না । এত ডিফারেন্ট সব চিন্তাধারা ওদের । একজন ক্রিয়েটিভ অন্যজন লজিক্যাল মানুষ । তবুও বহুবছর একসুত্রে ওদের বেঁধে রেখেছিলো , গভীর প্রেম ।

হঠাৎ এক ঝড় এলো । সামুদ্রিক ঝড় । সব ওলট পালট হয়ে গেলো মূহুর্তেই । তবুও ময়না ওকে ত্যাগ করেনি । করতে চায়নি । শুধু লোক দেখানো সম্পর্কটা চায়নি । হৃদয় উথালপাতাল করা প্রেম

আজও আছে মৈনাকের জন্য । কিন্তু ঐ মানুষটি বদলে গেছে । **ময়নাকে ও সরল পাখি নয় এক কূট ও কুচক্রী ধনী বলে ভাবতে শুরু করেছে ।**

ভেঙে দিলো ঘর । এতদিন সামুদ্রিক জীবনে অভ্যস্থ হয়েও মৈনাক বুঝলো না যে সাগরের ঢেউ এসে কত সহজেই ভেঙে দেয় বালির ঘর কিন্তু সেই ঘরটা বানানোই সবচেয়ে কঠিন !

অঝোরে কাঁদছে ময়না । ভারতের বুকে । এক অখ্যাত নগরের ছোট বাসায় । আর ওলিম দেশে কান্নার ঢেউ তুলেছে স্যাম । আজ খুব কাঁদছে । হর্ষ বিষাদে ।

তবে আজ রাত্রে ওর ঘুম হবে । শান্তির ঘুম । গাঢ় ঘুম । যা বহুদিন , বহুবছর হয়নি ।

বহু যুগের ওপাড় হতে, দুই হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকছে ঘুমপরী । এরা ফেরি লাইটস্ সৃষ্ট নয় । একদম নির্ভেজাল বাস্তব ।

যদি একে বাস্তব বলো আদৌ !!!

চামেলি ফুল

চামেলি ফুল

এমন কোনো গ্রামের নাম জানো

যেখানে আজও সংস্কৃতে সব কথাবার্তা ও সরকারি কাজ হয় ? ঠিক এরকমই এক গ্রাম আছে ভারতে নাম যার ঝিরিয়ালি । উত্তর ভারতের এই গ্রামে আজও সাধারণ মানুষ সংস্কৃতে কথা বলে আর সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি কাজ করে থাকে ।

এই গ্রামের প্রতিটি মানুষই লিপ্ত চাষবাসে । ফসল বোনা আর শস্যকণা খুটে খেতে অভ্যস্ত এইসব মানুষের সারল্য আর সততা সত্যি আধুনিক যুগে ঈর্ষনীয় !

পুরাতন লিপি ঘেঁটে ওরা অনেক জলসেচ ও চাষের প্রথা আবিস্কার করেছে যার ফলে ওদের গ্রাম একেবারে শস্যশ্যামলা ! পূর্ণকুম্ভ , সবসময়ই । পাখির গান আর সতেজ বাতাসে ভরে ওঠে প্রতিটি আঙিনা !

এখানে বাস করে এক ব্রাহ্মণ পরিবার । সারা গ্রামে ওরাই একমাত্র অভিজাত । তাতে কারো কিছুই যায় আসেনা কারণ এখানে কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না । এই জমিদার পরিবারটিতে ; মালিকেরা সবাই চাষীদের সাথেই ক্ষেত খামারে কাজ করে । ওদের সুখ ও দু:খে ভাগ বসায় । হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করে । মেয়ের বিয়ের সময় খাটাখাটনিও করে যেন নিজের মেয়েরই বিয়ে ।

তবুও এখানে **অনার কিলিং** চলে । নিজেদের পরিবারের কেউ যদি এইসব নিচু জাতের মানুষের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তাহলেই পরিবারের কর্ত্তাগণ তাদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে ।

আইন নিরুপায় । এটা ওদের পারিবারিক ব্যাপার ।

মেয়ে ও পুরুষেরা স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেয়-- এটা লোকে দেখলেও আসলে ওদেরকে বাধ্য করা হয় আগুনে প্রবেশ করতে ।

জমিদার, **ঠাকুর সাহেব** আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত । দিল্লি থেকে ভাষাবিদের ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন ।

ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড । দিল্লিতেই থেকেছেন অনেকটা সময় । প্রথমদিকে সংস্কৃত বলা মানুষটির অসুবিধে হত কিন্তু পরে সব মানিয়ে নেন ।

এক সহপাঠিনীকে বিয়েও করেন তবে সৌভাগ্যবশত: সেও ব্রাহ্মণ হওয়ায় কোনো অনার কিলিং ঘটেনি !

পরে অবশ্য পাশা উল্টে যায় । ভদ্রমহিলা অর্থাৎ আমাদের চামেলির মা, **চৈতালি** এক সাহেবের সঙ্গে পাড়ি দেন সুদূর পরবাসে ।

পালিয়ে যান আর কি ! লোকে বলে ওটা হয়েছে ওদের পরিবারের রক্ষণশীল ভাব আর ওর বাবার পসেসিভ স্বভাবের কারণে । অনেকেই মাকে চরিত্রহীনা বলে ।

ভদ্রমহিলা যখন যান তখন চামেলির বয়স খুবই কম । সবে বুঝতে শিখেছে । পরে অবশ্য একটু বড় হলে মাকে খুবই মিস্ করতো । যখন প্রথম পিরিয়ড হয় তখন ওকে সাপোর্ট করার কেউ ছিলো না । কাজের লোক আর বুড়ি দাইমা সম্বল । কিন্তু মা হল অন্য জিনিস । মায়ের গায়ের গন্ধ আর হাতের পরশ কি আর অন্য কোনো লোক মেটাতে পারে ?

কিছুটা একাকীত্বে ভোগা মেয়ে চামেলি ডুবে যায় পড়াশোনাতে । ওর মা তো বিদুষী ছিলেন । তাই ওর বাবাকে ছেড়ে এক সাহেবের সাথে চলে যান । মা অনেক বড় স্কলার, ওর বাবার চেয়ে । ফার্স্ট । একই ব্যাচে যেখানে বাবা সেকেন্ড !

ভদ্রমহিলা বহু পুঁথি রচনা করেছেন । সবই তার জ্ঞানের পরিচয় দেয় । মেধাবী কন্যার যশস্বিনী হতে সময় লাগেনি । তাই হয়ত গোরা সাহেব তাকে বধূ রূপে বরণ করেছেন । বিদেশে ওর মা প্রতিষ্ঠিত। ভাষাবিদ্ হিসেবে । কিন্তু মেয়ে চামেলির সাথে তার কোনোদিন কোনো যোগাযোগ হয়নি ।

চামেলির এটাই একটা নাইটমেয়ার ! **ওর বাবা আর মায়ের মুখোমুখি দেখা হচ্ছে , তারপর বাবা অনার কিলিং করাচ্ছেন ওর মাকে !**

গহীন রাতে এই স্বপ্ন বা দু:স্বপ্ন দেখে লাফিয়ে উঠেছে কতবার । দাইমা ওকে বুকে করে রেখেছে । পরে বাবার কাছে আশ্রয় পেয়েছে ।

ওদের ঠাকুর পরিবারের লজিক হল এই যে গরীব গুর্বোদের সাহায্য করো , মঙ্গল করো কিন্তু ভুলেও বিয়ে করোনা । ঐ দূষিত রক্ত তোমার পরিবারে ঢুকে পড়বে !

মাকে আজকাল ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রামে দেখে। আসলে সার্চ করতেই বেরিয়ে পড়েছে।

ওর বাবা **ঠাকুর সাহেব** আর বিয়ে করেন নি। কিন্তু কানাঘুষো চলে যে গ্রামের বাইরে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার তাদের উপযুক্ত কন্যাদের বিবাহ, ওর বাবার সাথে স্থির করতে চান। কিন্তু ওর বাবা হয়ত আজও চৈতালিকে কিংবা তার ঠকানোকে ভুলতে পারেন নি। তাই একাকী এই জীবনের বোঝা বয়ে চলেছেন।

চামেলির অবশ্য খাওয়া পরায় কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু মনের ভেতরের অনেকটা জায়গা আজও খালি পড়ে আছে। মায়ের আঁচল কী বস্তু তা জানা হলনা।

মায়ের সাথে ফেসবুকে কানেক্ট করেছে। মাও হাসি মুখে যোগাযোগ করেছেন। বাবার কথা জানতে চেয়েছেন।

--ইজ হি স্টিল আ পসেসিভ পার্সেন ?

চামেলি বেশি কথা বাড়ায়-নি কারণ এটা ওদের প্রাইভেট ব্যাপার। ওরা গুরুজন। যাইহোক্ না কেন ওর তাতে মতামত দেওয়া, জাজ করা- অশোভন।

ভারতীয়রা করেনা এসব। ভারতীয় সমাজে এগুলো নিন্দনীয়।

ওদের ক্ষেতে জাফরান চাষ হয়। ওরা বলে কেশর।

মূলতঃ নারীরা এই ক্ষেতে কাজ করে। ভোরের শিশির মেখে ; বেগুনি পুষ্প চয়ন এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। সবুজ সবুজ কাপড় মাথায় বেঁধে যখন মেয়েরা ফুল তোলে তখন মনে হয় এই বুঝি ভূস্বর্গ ! খয়েরি মাটি, হলুদ ঝুড়ি, বেগুনি ফুল আর সবুজ মাথার ওড়না সমস্ত মিলিয়ে এক শিল্পীর ক্যানভাস তৈরি হয় ওদের ঠাকুর ক্ষেতি সেদিন !

ওদের মহলের পেছনে অগ্নিকুন্ড আছে। সেখানে জহর ব্রত স্টাইলে আগুন জ্বালানো হয় ; যেখানে মেয়েরা লাফ দেয়। **জীবন দেয় আসলে**। নিয়ম অনুসারে ছেলেদেরও লাফানোর কথা যারা ওদের মতে উচ্ছৃংখল আর কমিউনিটির বাইরে বিয়ে করতে চায় কিন্তু কোনো কারণে ছেলেদেরকে প্রটেক্ট করে ওদের বংশ। বংশ বাড়ানোর আছিলায় !

এইসব কান্ডকারখানা দেখে ওর মনে হয় যে ওর মা এক অসীম সাহসী মহিলা । যিনি এইসব নীতির তোয়াক্কা না করেই নিজ সন্তানকে ফেলে রেখে পা দিয়েছেন মুক্ত বিশ্বে ! ওর মা ফেমিনিস্ট নন বরং ফ্রিডম ফাইটার । লোকে যতই গালি দিক আর মন্দ বলুক , চামেলির কাছে তার অদেখা মা চৈতালি আসলে **একরাশ বিপ্লব** । ওর পরিবারের কাছে আর বাবার কাছেও !

ওর মা ইমেলে লেখেন : আই ডোন্ট নো হোয়াট টু রাইট বেটি ! আই স্টিল লাভ ইওর পাপা বাট হি ওয়াজ সো পসেসিভ দ্যাট আই কুড নট হ্যান্ডেল !

অথবা : ডোন্ট ক্যারি এনি বিটারনেস অ্যাবাউট এনি থিং ইন লাইফ । ইট উইল কিল ইউ ।

ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ লাইক আ চাইল্ড !

নিজের ভালো নিজেকেই ভাবতে হবে । নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে । আর সবারই নিজ নিজ দানব আর যুদ্ধ থাকেই ।

ওর মাকে দেখতে রবীণা ট্যান্ডেনের মতন । নাকটা চোখা কিন্তু সামনেটা চ্যাপ্টা ! আর চামেলিকে দেখতে একেবারে ভিন্ন ধরণের, অমিশা পাটেল হতে পারে । ওর বাবার মতন নাকি পিসিদের মতন কেউ বলতে পারেনা । তবে ও নিজেও সুন্দরী । লোকে বলে : সিনেমায় নামার মতন মুখশ্রী আর ফিগার ওর ।

ও নিজে খুব পড়ে । ইচ্ছে আছে টেকনোলজি নিয়ে পড়ার । বাবা খুবই সাপোর্ট করেন । বলেছেন যে ও ইচ্ছে করলেই বিদেশে গিয়ে পড়ার পাঠ নিতে পারে কিন্তু বিয়ে করতে হবে পরিবারের ইচ্ছেয় । সেটা অবশ্য বাবা বলেন নি কিন্তু ও জানে যে ওদের পরিবারে, মেয়েদের বিয়ে তারা অন্য ধর্মে বা বর্ণে স্থির করলেই জহর করতে হয় । **জহর ব্রত** ।

আজও , স্বাধীন ভারতের মধ্যেই ।

ওর মায়ের সাথে প্রবাস জীবন নিয়ে কথা হয় । ওর মা কতনা জায়গায় ঘুরেছেন । গোবি মরুভূমি থেকে অ্যাটম বোমায় নষ্ট হওয়া শহর অবধি । গোবি মরুতে নাকি উনি ডায়নোর ডিম দেখেছেন । ফসিল হয়ে গেছে সেগুলো । আবার হিরোসিমা কিচ্ছু না এমন জায়গা

দেখে এসেছেন ; যেখানে ঐ বোমের থেকেও বেশি এফেক্ট হয়েছে বলে মনে করা হয় । গভীর সমুদ্রে উনি ডলফিনের সাথে ভেসে বেরিয়েছেন । দেখেছেন নিশীথ সূর্যের দেশ আরো কত কি !

শুধু বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে !

এখন মা নাকি এক পরিত্যক্ত হীরের খনিতে থাকেন ।

ওখানে একটি মেন্টাল অ্যাসাইলাম ছিলো, সেখানে নাকি মায়েদের এলাকার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক উন্মাদ মানুষ ভর্ত্তি ছিলো । ওদের দেশে নাকি মায়ের অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা বেশি পাগল ও পাগলিনী থাকে ।

আসলে মা বলেন যে ওখানে আগে এপিলেপ্সি, আলঝাইমার্স, অটিসম্ পারকিন্সন্স এসব রুগীদেরও উন্মাদ বলে চিহ্নিত করা হত আর মেন্টাল অ্যাসাইলামে রাখা হত । কিন্তু আদতে এরা পাগল নন নার্ভের অসুখে ভুগছেন ! পাগলের অর্থ হল যার মানসিক সমস্যা আছে । এখন লোকেরা বুঝতে শিখেছে তাই ঐ হসপিটালে আর কেউ নেই ।

পরিত্যক্ত এই হাসপাতাল হীরের খনির কাছেই ছিলো । সেই খনিও আজ পরিত্যক্ত কারণ অন্য কোথাও আরো হীরের সন্ধান পেয়েছে মানুষ ।

তবে দুস্প্রাপ্য খনিজ না থাকলেও মানুষ আজও এখানে ভ্রমণ করতে আসে । দেখে যায় উন্মাদ আশ্রম আর হীরের খনি । একটি অপূর্ব জলপ্রপাত আছে এখানে । সেটাও দেখার মতন বটে । আর আছে রেনবো রং এর গাছ । রেনবো ইউক্যালিপটাস্ । কান্ডটা পুরো রামধনুর মতন ।

মানসিক রুগীরা সেই জলপ্রাপতে নাকি আত্মহত্যাও করেছে বলে শোনা যায় ।

হীরের খনিতে ঢুকে খুঁজে নিতে পারো ছোটখাটো হীরক কুচি । আর এই এলাকায়, এইসব বস্তু দেখাশোনা করার জন্য একটিমাত্র পরিবার রয়েছে । বাবা , মা ও সন্তান নিয়ে সাত-আট জনের পরিবার । মাসে একবার সরকারি চিকিৎসক আসেন । আসে রেশন ইত্যাদি ।

ধূ ধূ প্রান্তরে এই পরিবারটি রক্ষণাবেক্ষণ করছে এই দ্রষ্টব্য বস্তুগুলো ।

এদেরই বড় ছেলে শহরে পড়তে যায় । সেখান থেকেই ওর সাথে মায়ের পরিচয় । মাকে ও নিজের সিস্টার বলে । মা এত বিদুষী যে ও আকৃষ্ট হয়েছে । মায়ের

দ্বিতীয় স্বামী তো মাকে ছেড়ে দিয়েছেন । একবার ওদের এস্টেটে, ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মায়ের কোমড় ভেঙে যায় । বেশি নড়াচড়া করতে অক্ষম ।

ওর দ্বিতীয় বাবা তখন মাকে একটি বাড়ি ভাড়া করে রেখে দেয় । নার্স সমেৎ । তার পাশেই থাকতো এই ছেলেটি যার নাম দোনোভান । দোনোভান তখন ওর মাকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে আসে । সিস্টার বলে ।

মা খুব মিশুকে । খুব সুন্দর কথা বলতে পারেন । সবাই বলে মা হিলার । কাছে থাকলেই ভালোলাগে । মায়ের গায়ের তাপমাত্রাও নাকি সবসময় বেশি থাকতো । লোকে মনে করতো যে জ্বর হয়েছে । কিন্তু সেটাই ওনার নর্মাল তাপমাত্রা । এটা হিলার হবার সাইন ।

মায়ের যখন নতুন বিয়ে হয় তার কিছুদিন পরে লিম্ফোমা ধরা পড়ে । এটা লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের ক্যান্সার । পাঁচবছর লড়াই চলে । তারপর সারা দেহে টিউমার ছড়িয়ে যায় । দেহ নষ্ট হয়ে যায় । কোমাতে চলে যান। তখনও চামেলির জন্ম হয়নি । যাকে মাত্র কয়েক দিন সময় দিয়েছিলেন চিকিৎসক তিনিই আবার বেঁচে ওঠেন । মিরাকেল্ । সমস্ত টিউমার মিলিয়ে যায় । ক্যান্সার ফ্রি হয়ে বেঁচে ওঠেন । পরে চামেলি জন্মায় । হয়ত তাই বাবা পসেসিভ হন । লোকে এরপরে

ওনাকে হিলার হিসেবে দেখতে শুরু করে । যিনি নিজের ক্যান্সার সারিয়ে ফেলেছেন ।

তবুও ওর দ্বিতীয় স্বামী এরকম এক পঙ্গু মহিলাকে নিয়ে থাকবেন না ; তাও সে এক ভারতীয় কাজেই অন্য বাড়িতে রেখে নিজে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকতেন । হয়ত হিলিং ব্যাপারটায় তার বিশ্বাস নেই । ভেবেছেন যে হাই ডোজের কিমোথেরাপিতে সেরে উঠেছেন ।

ওদের কোনো সন্তান নেই । তাই অসুবিধে হয়নি তার চামেলির মতন । ওর মা চৈতালি অনেকটা ফেলুদার সিধু জ্যাঠা কিংবা শার্লক হোম্সের দাদা মাইক্রফট্ হোম্সের মতন । চলমান বিশ্বকোষ । কাজেই দোনোভানের কোনো তথ্য প্রয়োজন হলেই ওর মা বলে দিতে পারেন । আর বাবার সাথে বনিবনা না হলেও মা এমনিতে নাকি খুব রসিক ও কোমল স্বভাবের মানুষ । মা কোনো তিক্ততা মনে রাখেন না । এগুলি মায়ের পজিটিভ সাইড । দোনোভান নাকি মাকে খুব সেবা করে । মেক আপ করে দেওয়া , ভালোমন্দ রেঁধে খাওয়ানো সব করে । ওর নিজের মা বছর খানেক হল মারা গেছেন । ঠাকুমা আছেন । উনি আবার অন্ধ মানুষ । দোনোভান যে সম্প্রদায়ের ছেলে সেই বুলুং জাতির মধ্যে ওর ঠাকুমা সর্বপ্রথম মহিলা প্রিস্ট ।

অন্ধ মহিলা হলেও উনি নাকি জ্যোতি আবিষ্কার করতে পারেন । লোকের কপালে জ্যোতি দেখেন । দোনোভান জন্মাবার সময় উনি প্রথম জ্যোতি দেখেন ওর মায়ের কপালে । সেই থেকে শুরু । উনি ওদের কমিউনিটির দাইমাও ছিলেন । দোনোভান যখন জন্মায় তখন উনি দেখেন ওর মায়ের কপালে আলো ।

যার কপালে আলো দেখেন তার শুভ হয় । এর আগে ওরা মাটির ঘরে থাকতো । ঐ আলো দেখার পরে ওর বাবা এই পরিত্যক্ত অঞ্চলে রক্ষক হিসেবে সরকারি চাকরি পায় । তাতে ওদের পুরো পরিবারের কপাল ফিরে যায় । ওরা যেহেতু বনের মানুষ তাই সরকারি রেশন ফিরিয়ে দিয়ে বুনো হরিণ, শূকর, পাখি মেরে খায় । নদীর মাছ , শামুক ইত্যাদি , পাখির ডিম , মূগি,ঁ হাঁস আর টার্কির মাংস এবং বনের মধু খেয়ে কাটায় ।ওপরে মাংস ঝোলে । নিচে গনগনে আগুন । মাংস পুড়িয়ে বাতাবিলেবু আর আনারস সহযোগে খায় ।

রেশনের বদলে টাকা নেয় । মেয়েরা ঘরের কাজ করে । পশুপালন করে । ছেলেরা স্কুলে যায় । ওরা তিন ভাই দোনোভান , কেনি আর চিরুম্বিরি সবাই স্কুলে পড়েছে । মেয়েরা সবাই হাতের কাজ জানে । ঘরের কাজ ও পশুপক্ষী পালনে ওস্তাদ । ওর অন্ধ ঠাকুমা গোবর লেপে ঘরগেরস্ত পরিষ্কার রাখেন । মা রান্না

করতো । বাবা শিকার । ঐ পশুপাখি মেরে আনা আরকি ! ওর ঠাকুমাকে ওরা বলে **কিম্‌চি** ।

বাবাকে ওরা কোনোদিনও হাসতে দেখেনি । হাসি নাকি মেয়েদের কাজ । দোনোভানদের তিন ভাইয়ের দুটো জামা ছিলো । ওরা বদলে বদলে পরতো ।

সবাই স্কুল শেষ করেছে । দোনোভান সবচেয়ে মেধাবী বলে শহরে পড়তে গেছে ।

চৈতালি এখন ওদের সাথেই থাকেন । ওরা সরকারি দালানে থাকে । বড় কোয়ার্টার । কারণ ঐ মানসিক আশ্রমের ঘরগুলি তো সব ফার্নিচার সমেৎ পড়েই আছে ! বড় বড় আলো বাতাস হিমের ঘর ।

সতেজ গাছ আর দূরে প্রাকৃতিক এক ঝর্ণা । হীরের খনি বুঝি চাঁদনী রাতে চক্‌চক্‌ করে । অমাবস্যায় দেখা যায় হীরের টুক্‌রো । ঝিক্‌মিক্‌ করছে ।

চোখে ঝিলমিল লেগে যায় !

ওদের মা মারা গেছে বলেই কিনা চামেলি জানেনা **ওর মা চৈতালিকে** ওরা খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করে । ওর মাও

ওদের বাড়ির মেয়েদের পড়ায় । ওর বাবা ওদের কমিউনিটির ছেলে নিয়ে আসবে মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য । একজন পাত্র খুব ভালো । তার বসার জন্য মেন্টাল অ্যাসাইলামের শক্ থেরাপির ঘরটা বাছা হয়েছে । সুন্দর করে চৈতালির নির্দেশে সেই ঘর সাজানো হয়েছে । পাত্র খুব ভালো । এরকম পাত্র হাতছাড়া যেন না হয় । মেয়ের নাম হাস্না ।

তার কপালে ওর বুড়ি , দৃষ্টিহীন ঠাকুমা আলোর ঠিকানা দেখেছেন ।

পাত্র কী কাজ করে জানতে চেয়েছে ফেসবুকে সবাই ---- মা জানিয়েছেন যে পাত্র ওদের মতে ভীষণ ভালো ।

সে একটি এলাকার পিওন । মোটরবাইকে করে ভট্ভট্ করে মেল ডেলিভারি করে । চক্চকে পোশাক আছে কাজের । কোট-প্যান্ট গোছের । কাজেই বুঝতেই পারছো !

ওদের বাড়ি কেউ এলেই ওরা মধু মুখ করায় । অরণ্যের মধু আনে ওর লুপ্ত শহরের কেয়ারটেকার বাবা । মধু খেতেই নাকি দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালো ।

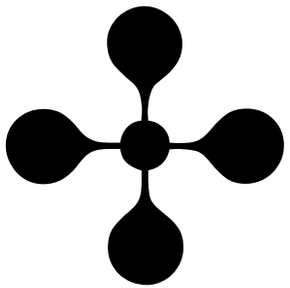

দোনোভানের এলাকার কাছেই আছে দাজা কমিউনিটি । এরা একটু প্রাচীন পন্থী । ওদের সমাজে জুয়া খেলাকে পুণ্য ধরা হয় । যারা অনেক টাকা পায় তারা আসলে হোলি স্পিরিটদের দাক্ষিণ্যেই এগুলি পেয়েছে । কাজেই লোকে নতুন উদ্যমে নেমে পড়ে । এই সমাজের পুরুষেরা বেশিদিন বাঁচেনা । ওরা পশু পুজো করে । ওদের দেবতা সমস্ত পশুরা । সিংহ হল মূল গড । আর গডেস্ হরিণী । কাজল নয়না হরিণী আসলে ওদের দেবী । মাত্র ৩০- থেকে ৩৫ ওদের পুরুষদের আয়ু । তারপরে কোনো না কোনো অসুখে তারা মারা যায় । মেয়েরাই সংসারের হাল ধরে থাকে । জুয়া এমন পুণ্য কাজ যে বাড়িতে বসেও ওরা জুয়া খেলে । এখন তো

অনলাইন গ্যাম্বলিং হয়েছে তাই ওদেরই সুবিধে । জুয়ার অর্থ দিয়েই ওরা সন্তান পালন , চিকিৎসা , বিয়ে শাদি দেওয়া ও খাওয়াপরা যোগাড় করে ।

তবুও জুয়া একটি বাজে নেশা তো ! কাজেই অনেকেই **জুয়া ফাঁদে** পড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে । ছেলেরা মৃত । জুয়ায় সব গেছে । বাড়ির মহিলারা অর্ধ উন্মাদের মতন হয়ে যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে । ফুটপাথে দিন কাটাতে বাধ্য হয় , কারো কারো কঠিন অসুখ ধরে । চিকিৎসার পয়সা নেই । কিন্তু জুয়া পবিত্র একটি কাজ বলেই ধরা হয় । কেউ জুয়া খেলা ছাড়েনা ।

পুরুষেরা যে কয় বছর জীবিত থাকে সেই কবছর চুটিয়ে জুয়া খেলে নেয় । সবসময় সবাই জুয়াতে ।

শিশুদেরও জুয়া হয় । বুঝতে শিখলেই স্কুল থেকে ফিরে জুয়াতে বসে ওরা । কেউ বাধা দেয়না । কারণ জুয়া একটি পবিত্র জিনিস । যারা জুয়া কন্ট্রোলে রাখতে সক্ষম তারা ওদের সমাজে মহামানব ।

একদিন সরকার থেকে জাতীয় ছুটি দেওয়া হয় । সেটা জুয়ার দিন । গ্যাম্বলিং ডে । নানান আইন দিয়ে জুয়াকে মোটামুটি ভদ্রস্থ খেলা করলেও মানুষের নেশা তো আর বাগে আনা সহজ নয় । কাজেই অনেক মানুষ

বিশেষ করে মহিলারা জুয়াতে হারিয়ে ফেলে নিজেদের সর্বস্ব ।

চামেলির মা এখন ঐসব অসহায় মহিলাদের কাউন্সেলিং করেন । এই পরিত্যক্ত মানসিক আশ্রম এখন সর্বহারা নারীদের পীঠস্থান ।

মায়ের একটা অদ্ভুত চুম্বকের মতন ব্যক্তিত্ব আছে ।

হেসে সবাইকে জড়িয়ে ধরে স্বাগতম জানান । বলেন : বডি টু বডি হিলিং এনার্জি পাস্ হয় ।

মহিলাগণ সত্যি একটু একটু করে সহজ জীবনে ফিরে আসে । ওদের সরলতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । মানুষগুলি জুয়া খেললেও খুব জেনেরাস্ আর সাদাসিধে । জুয়া তো ওদের সমাজে পাপ নয় বরং পুণ্য । কেবল মেপে খেলতে হবে । আর ঈশ্বর না দিলে হঠাৎ করে এতটা টাকা কেউ পায় ? কাজেই পবিত্র জিনিস তো বটেই !

আর ঐ টাকাতেই ওদের জীবন চলে । ওটাই ওদের কাজ । কর্ম । প্রফেশান । সকাল বেলা উঠেই মেয়েরা সবাই জুয়াতে বসে পড়ে । পুরুষেরা কম বাঁচে বলে

কিছু ফূর্তিও করে নেয় জুয়ার পাশাপাশি । তাই ওরা সকাল থেকে বসে না ।

চামেলির মা চৈতালি দেখেছেন যে ওদের মহিলারা যে জুয়াতে আসক্ত হয়ে পড়ে তার তিনটি কারণ । **প্রথমত: ওদের বাড়ির পুরুষের আয়ু সবাই জানে । দ্বিতীয়ত: জুয়া পবিত্র কাজ বলে কেউ বাধা দেয়না । আর শেষ কারণ হল এই যে ওদের সংসার চলে এই টাকাতেই । কাজেই একটু ভালো করে থাকবে বলে আর একটু বেশি রোজগারের নেশায় ওরা অ্যাডিক্ট হয়ে যায় ।**

মা নিজের আঁচল বিছিয়ে রেখেছেন । ওদের কাউন্সেলিং করে করে সঠিক পথে নিয়ে আসেন । বলেন : ওরা আমাকে বিশ্বাস করে কারণ এখানে ওরা **আন-কন্ডিশনাল লাভ** পায় । আমি কাউকে জাজ্ করিনা । দোষে গুণেই মানুষ , ভুলটা শুধু শুধরে নিতে হবে । ওকে সুযোগ দিলে ও পরে অন্যদের বোঝাতে সক্ষম হবে । আমি সমাজ শুদ্ধ না করে নিজেকে শুদ্ধ করার কায়দা শিখিয়ে দিই । সবাই শুদ্ধ হলেই সমাজ বিশুদ্ধ হবে ।

চামেলির বাবা তো ওকে বলেইছেন যে ও ইচ্ছে করলেই বিদেশে পড়তে যেতে পারে । কাজেই সে পড়তে গেলো ওর মায়ের দেশে । ওর বিষয় মেরিন সাইবারনেটিক্স । মানুষ বিহীন জলযান নিয়ে ওর কাজ । **রোবট আর স্বপ্ন নয় রোবট এখন বাস্তব ।** কতনা রোবট চালিত জাহাজ আর সাবমেরিন এখন দুনিয়াতে ভাসছে । যেমন মানুষ ব্যাতীত মহাকাশ যান চলে অনেকক্ষেত্রেই- সেরকম জলেও চলে রোবট যান ।

এইসব নিয়েই কাজ চামেলির । তবে ওদের গ্রুপে মেয়ের সংখ্যা অনেক কম ।

ওর মাও ওকে খুব উৎসাহ দিয়েছেন । তবে বাবা জানেন না যে ওর মা যেই দেশে আছেন ও সেখানেই যাচ্ছে কায়দা করে ।

সবাই ভেবেছিলো যে ও সমুদ্র মন্থন করে কোনো রাজকুমারকে নিয়ে ফিরবে কিন্তু বাস্তবে ও ফেরার প্ল্যান করলো দোনোভানকে নিয়ে ।

যেই অপরিচিত পুরুষ ওর পঙ্গু মাকে আগলে রেখেছে নিজের মায়ের মতন , এত ভালোবাসা , শ্রদ্ধা পাচ্ছেন ওর মা যা নিজের স্বামীও দেয়নি তাকে সেই পুরুষ কোনো সাধারণ গড়পরতা মানুষ হতেই পারেনা ।

কাজেই তাকে ভরসা করা যায় । এমন একজনকেই সারাজীবন খুঁজেছে চামেলি যাকে বিশ্বাস করা যায় , যার ওপর নির্ভর করা যায় । যে প্রকৃতই রক্ষক, ভক্ষক নয় স্বামীরূপে । ওর তো মা ছিলোনা কিন্তু বাবা ছিলো । বাবার সাথে সাংঘাতিক ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও ও বাবাকে ভালোবাসে । কিন্তু কোথাও একটা বিরাট ফাঁক ছিলো । সেই ফাঁকটাই ভরাতে চায় পতির মাধ্যমে ।

দোনোভানকে ও ভালোবাসে কিনা কেউ জানেনা । ও নিজেও জানেনা । কিন্তু ওকে ভরসা করা যায় ।

ওকে তো একদিন এমু পাখি তাড়া করলো । এমু হল উটপাখির মতন এক বিশাল পাখি । তার ডিম বড় সাইজের ল্যাংড়া আমের মতন আর ময়ূর রং এর ।

ওমলেট করে মাশরুম আর পেঁয়াজ দিয়ে দারুণ লাগে । সেই এমুর তাড়া খেয়ে ও সাইকেল সমেৎ উল্টে পড়ে ।

বনের ধারে, এক অপরূপ সূর্যাস্তের সময় !

তখন দোনোভানের গায়েই তো আশ্রয় পেলো । নির্ভরতা । এক অদ্ভুত প্রশান্তি !

ওদের বাড়িতে তো কত ছেলে আসে । সবাই ওদের শ্রেণীর আর ধনী । বিয়ে হতেই পারে । জহর না হয়ে । তাদের পরিবার ওদের সমকক্ষ । ছেলেগুলিও ব্রিলিয়্যান্ট বিজনেসম্যান অথবা ইকোনমিস্ট কিংবা উঠ্‌তি পলিটিশিয়ান । কিন্তু চামেলির মনে ধরেনি একজনকেও । ওদের কোনো সারল্য নেই । ওদের স্পর্শ সাপের পরশ । ওদের হাই বলে হাত তোলাকে ওর সাপের ফণা মনে হয় । ওদের কায়দা কানুন বেশি মনুষ্যত্ব কম । ওরা মানুষ মেরে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে থাকে । মায়ের মতন ওরা আন কন্ডিশনাল লাভ বিলাতে জানেনা । জানেনা দোনোভানের মতন অচেনা মানুষকে আনন্দের স্বর্ণখনিতে নিয়ে যেতে । ওরা নিজেদের তবুও মানুষ বলে । দানব বলে না । ওরা হিরণ্যকশিপুর গল্প পড়ে হাসে । গালি দেয় । আসলে **নিজেদের বাড়ির সমস্ত আয়না বোধহয় ভেঙে গেছে ওদের ।**

দোনোভান এক চিল্‌তে মানুষ যার ধর্ম মানবতা আর কর্ম জীবের মঙ্গল করা ।

মায়ের জুয়া কর্মকান্ডেও দোনোভান আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে । প্রবল তুষারপাতের পরে, কাচের জানালায় লেগে থাকা তুষারকণার মতন !

তবুও চমেলির নিজ বাবাকে কিংবা পরিবারকে জানাবার সাহস নেই ।

বাবা, দুটো ধাক্‌কা সামলাতে পারবেন কিনা এই বয়সে তাই নিয়ে ওর চিন্তা আছে । এক তো ও মায়ের সাথে যোগাযোগ করেছে আর ঐদেশেই পড়তে গেছে আর দ্বিতীয়তঃ দোনোভানকে বিয়ে করা মানে জহরের সম্মুখীন হওয়া । ওর প্রাচীন পন্থী পিতা কি আর এসব মেনে নেবেন পারিবারিক প্রথাকে অস্বীকার করে ? আর মায়ের ওপরে তো উনি ক্ষেপেই আছেন !

তাকে হেলায় ফেলে মা চলে গেছেন অন্য পুরুষে আর এখনও উনি একা ; বিচ্ছেদের বোঝা বইছেন । ওদিকে মা আবার মেয়েকেও কেড়ে নিতে চাইছেন জানলে বাবার কী হবে ? বাবা কি আর সইতে পারবেন এত কষ্ট ? জহর যদি হয়ও তাতে ওর প্রাণটা যাবে । কিন্তু বাবার কী হবে ? তিনগুণ কষ্ট হবে তখন ! ও শুনেছে ওর মায়ের কাছে যে এমন মানুষও আছে যারা পরিবারে কেউ মারা গেলে তার প্রিয়পাত্রকে গলা টিপে মেরে

ফেলে যাতে সেই মানুষটিকে একা পরপাড়ে যেতে না হয় ! আবার আমাদের জহরের মতন, স্ত্রীকেও মেরে ফেলে গলা টিপে এরকম দ্বীপও আছে জগতে । মা ঘুরে এসেছেন । কাজেই বাবারা যা করছেন তা অনেকেই করছে দুনিয়ায় । তবুও বাবার একাকীত্বের কথা ভেবে খুব দু:খ হয় । বুকটা টনটন্ করে ওঠে ।

বাবাকেও কেউ গলা টিপে !! ওর জহরের পরে ?

Information ::

- **JHIRI :: Sanskrit speaking village in Madhya Pradesh**

There are other villages in India also .

- **Ramana Maharshi :: It is said that a blind midwife**

attending to his birth saw a brilliant light just as the baby emerged.

- **http://anitamoorjani.com/**

she has cured her stage four cancer herself …New York Times best selling author.

দোনোভান ; কাজ হয়ে গেলে একা একা সূর্যাস্ত দেখে । টিলার ওপরে চুপ করে বসে থাকে । ও পাশে গিয়ে বসে । ওর পঙ্গু মা ওকে সমর্থন জানায় ।

হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মা জুয়াড়িদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্রত পালন করেন , ব্রতচ্যুত হতে আগ্রহী নন কোনোমতেই --আর মনে মনে হয়ত চান যে একমাত্র সন্তান মেরিন রোবটের খপ্পড় থেকে বেরিয়ে এই এলাকায় থিতু হোক্ দোনোভানের হাত ধরে । আজকালকার জগতে কে কেমন মানুষ বাইরে থেকে বোঝা দায় । পরিবার পরিজন, শিক্ষা দেখে কিছুই বোঝা সম্ভব নয় । কিন্তু দোনোভানকে উনি চেনেন । কাজেই এই অচিন পাখির ডানায় নিজ সন্তান থাকুক দুধে ভাতে এই ওনার একমাত্র চাহিদা এখন ।

মেয়ে বলেছে ওদের জহরের কথা । উনি বলেছেন :: তোমার ওখানে ফিরে যাবার কোনো প্রয়োজন আছে কি ? আমি তো কোনো কারণ দেখছি না ! আর ফিজ এর কথা যদি বলো তাহলে সেটা তোমার প্রতি তোমার বাবা তার কর্তব্য পালন করেছেন জন্মদাতা হিসেবে ।

আর পরে তুমি রোজগার করে সেই অর্থ শোধ করে দিতেই পারো যদি উনি ফেরৎ চান !

কত সহজেই ওর মা এগুলো বলতে পারলেন । কিন্তু ও নিজে চোখে দেখেছে ওর বাবার একাকীত্ব । ওদের সমাজে কত রূপসী , গুণী নারীরা নিজেদের সবটুকু ওর বাবার পায়ে অর্পণ করার জন্য বসে ছিলো । কিন্তু ওর বাবা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি । সে কি মায়ের প্রতি অমল আকর্ষণের জন্যই নয় ?

এরকম পুরুষেরা তো দু তিনটে করেও বিয়ে করে !

বাবা হয়ত পসেসিভ ছিলেন মায়ের মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে আসা দেখে । আচ্ছা, ওরা কি কখনও এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন ? নাকি সম্পর্কটা তেতো হয়েছে শুধু ভুল বোঝাবুঝি আর ইগোর বশে ?

কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করবেন না ?

চামেলির কিন্তু মনে হয় **পসেসিভ হওয়া একধরণের গভীর প্রেমেরই প্রকাশ । তবে প্যাথোলজিক্যালি পসেসিভ হওয়া নিশ্চয়ই একটা অসুখ ।**

বাচ্চারা যেমন শিশুকালে করে । এই খেলনাটা আমার ! কেউ ধরবে না । ধরলে কেন ?

সেইরকম । কিন্তু ওভার পসেসিভ হওয়া বোধহয় অবসেশন । মা ঐ সরু রেখাটা দেখতে পেয়েছিলেন তো ? সীমারেখাটা ? কে জানে !

মায়ের পার্টনার **লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া** আর মা তো কোনোদিনই বিবাহ করেন নি । ও আগে ভাবতো ওর মা ওর বাবাকে ডাইভোর্স করে চলে গেছেন । কিন্তু এখানে এসে শুনেছে যে মা এমনিই চলে এসেছিলেন । ভার্সিগোড়া এখন যেই গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আছেন সে খুব ভালো আঁকে । আন্তর্জালে বসে বসে নানান পাবলিশিং কোম্পানির হয়ে ইলাস্ট্রেশান করে । এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম মানে ডোমেন কেনাবেচা করে । এক আরব শেখ্ নাকি ডুবাই থেকে ওর ২৫০টা ডোমেন নেম কিনে নিয়েছেন ! চড়া দামে । চামেলি ভাবে যে ওর মা পঙ্গু তবুও দৌড়ঝাঁপের কাজে নিযুক্ত । আর সেটা স্বেচ্ছায় করেন । অন্যদিকে ভার্সিগোড়ার পার্টনার একদম সুস্থ সবল হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জালে কাজ করে । খুবই অদ্ভুত লাগে ওর । জগতে কতনা বিচিত্র জিনিস ঘটে । হয়ত এগুলি আমাদের চিন্তার সমস্যা । আমরা যাকে বিচিত্র মনে করি সেগুলি অন্য কারো কাছে সত্যি সত্যি আনন্দদায়ক । **আইনস্টাইন কি একেই থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি বলেছেন ?**

ওর বাবা মায়ের কোনোদিনই ডাইভোর্স হয়নি আইন সম্মত উপায়ে । মা বহুদিন দেশ ছাড়া । বাবাও আর কোনো সঙ্গিনী নিয়ে থাকেন নি । অর্থাৎ এখনও মা ওনার বিবাহিতা স্ত্রী । আইনতঃ । হয়ত বেশিদিন সেপারেটেড্ ।

দোনোভানকে নিজের সমস্যার কথা খুলে বলেছে । বলেছে যে ওর পরিবার ; তাদের অমতে অন্য জাতে বিবাহ করলে পাত্রপাত্রীদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে ।

দোনোভানের কিম্‌চি মানে অন্ধ ঠাকুমা চামেলির কপালে রাজটিকা দেখেছেন । আলো দেখেছেন । **বলেছেন :: এই মেয়ে খুব ভালো মেয়ে, এরজন্য চাঁদ উঠবে ।**

দোনোভান ওদের কেশর অর্থাৎ জাফরান বাগিচা দেখে মুগ্ধ । ও নিজে গিয়ে বাবাকে প্রস্তাব দিতে চায় । বলে :: **গাঢ় গোলাপী ফুলের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে , পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইবো । তবুও কি উনি না বলবেন ?**

হায়রে দোনোভান ! জানেনা বেচারা সভ্য ভারতের অসভ্য মানুষের কথা । ও বলে :: আমাদের সমাজে তো লোকে বিয়ে না করেও থাকে । একসাথে অনেক বৌ নিয়ে থাকে । তাতে কী ক্ষতি হয় ?

কী ক্ষতি হয় বা হতে পারে তা কি আর চামেলিও জানে ? কিন্তু ওকে সেসব বোঝাবে কে ?

ও ল্যাভেন্ডার ক্ষেত আর তার বেগুনি আভা দেখলেই বলে ওঠে :: ঠিক্ আমার শ্বশুরবাড়ির মত তাই না ?

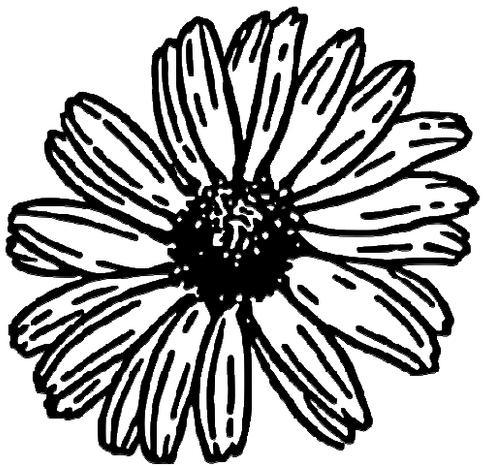

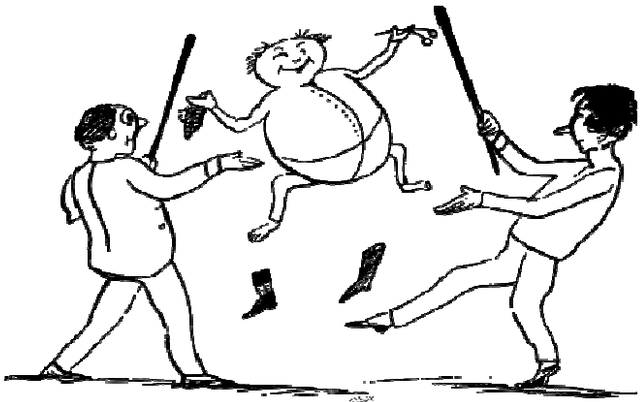

খুব কষ্ট হত চামেলির । কারণ সে জানতো যে তার মা চাইলেও বাবা কোনোদিনই মেনে নেবেন না । ওর প্রাণ যাবে । হয়ত বা দোনোভানেরও !

এই সহজ সরল ছেলেটা, নিজের জীবনপণ করে ওখানে যেতে ইচ্ছুক হলেও ওকে মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না চামেলি ।তাই একপ্রকার নীরব হয়ে থাকে ।

মায়ের কাজও বেড়ে চলেছে । মা চান এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সামলাক চামেলি, দোনোভানের সাথে ।

মেরিন ফেরিন চুলোয় যাক্ !

জামাই হিসেবে কোনো রোবটকে কল্পনা করতে অসুবিধে হয় । বেশি ওদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে শেষমেশ রোবটই হয়ত জামাই হয়ে এসে জুটবে । কে জানে ! তখন ওর জন্য Diesel/ পেট্রলে রান্না বিরিয়ানি আর স্পঞ্জের কেক বেক্ করতে হবে ! কোল্ড ড্রিঙ্কস্ হিসেবে খাবে আলোক তন্তু । মানুষি চালাকিতে প্রণাম করবে সেই জামাই , মেশিন ম্যান ---- নিছক শ্রদ্ধায় নয় ! ভালোবাসবে লাভ-বটন টিপে । হাসবে কাঁদবেও সেভাবেই । আর মনোমালিন্য হলে ডিলিট টিপে সম্পর্ক শেষ করে দেবে ।

দোনোভানই জামাতা হিসেবে একদম উপযুক্ত । কিন্তু ওর স্বামীর (এখনও আইনত: হাজব্যান্ড) ভয়ে মেয়ে রাজি হয়নি ।

মেয়েও দোনোভানকে খুব ভালোবাসে । ভরসা করে । বলে :: ওর ওপরে নির্ভর করা যায় ।

কিন্তু ওর বাবা আর পরিবারের ভয়ে ও কম্পমান ।

দিনের পর দিন চোখের সামনে মেয়েকে শুকিয়ে যেতে দেখছেন চৈতালি । নিজে চলে এসেছিলেন লেরয় গোগোলের হাতে ধরে ঐ অস্বস্তি:কর পরিবেশ থেকে বাঁচতে । ওর বাবা এত পসেসিভ ! মারধোর করেননি । উনি খুব ভদ্র ও মৃদুভাষী কিন্তু কঠোর হয়েছেন । রাতে শুতে আসেন নি । ফোন ধরেননি । এইভাবে শাস্তি দিয়েছেন । কোনো মানুষ যদি একই ছাদের তলায় থেকে অন্যকে সম্পূর্ণ ইগনোর করে তার থেকে বড় শাস্তি বুঝি আর কিছু নেই ।

এই অবহেলা অসহ্য । শেষে লেরয়ের শরনাপণ্ন হন । লেরয় হয়ত এক বাদামী নারীকে ভোগ করার প্ল্যান করেছিলেন । নাহলে এই অবস্থায় চৈতালিকে ত্যাগ করবেন কেন ? ওনাকে একলা একটি বাড়িতে নার্স দিয়ে রেখে দেন । সামান্য টাকা আসতো কিন্তু লেরয় আসেন নি একবারও । বরং ওর গার্লফ্রেন্ড মলি ব্যারন

আসতো । মলি পেশায় আঁকিয়ে, কমার্শিলায় আর্টিস্ট আর কি ! তাই হয়ত কিঞ্চিৎ সেন্সিটিভ, কে জানে । লেরয় নাকি ওকেও আসতে বাধা দিতেন ।

বলতেন : লেট হার ডাই ইন পিস্ !

ওকে জেস্‌মিন ফুল দিয়ে স্লো পয়জন করো ।

পঙ্গু তো আছেই , সেটাই আরো বেড়ে যাবে । কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবেনা !

(দুনিয়ায় ট্রু জেস্‌মিন আর ফল্‌স্ জেস্‌মিন দুই ধরণের ফুল আছে । সব না হলেও কিছু জেস্‌মিন বিষাক্ত । অর্থাৎ বিষাক্ত চামেলি ফুল দিয়ে স্লো পয়জন করার ফন্দি আঁটছেন লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া !)

চৈতালির গর্ভজাত সন্তান চামেলি কিন্তু নির্মল । বিষ কন্যা নয় । কাজেই বিষবৃক্ষের বিষ পুষ্প চামেলি কি পারবে চৈতালির জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে ? চিরতরে ? ক্যান্সারও তো পারেনি !

চামেলিকে খুলেই বললেন চৈতালি । বললেন যে ও যেন দোনোভানকে নিয়ে ওদের বাড়িতে না চলে যায় । ওর **বাবাকে আগে সব খুলে বলে ।** তারপর মতিগতি দেখে পরের স্টেপ নেবে । বাবা তো মত দেবেন না । কাজেই বিয়ে হবে অমতেই । তবুও জন্মদাতাকে একবার জানানোটা বাঞ্ছনীয় ।

চামেলি ধোঁয়াশায় । দোটানায় । কী করে ?

জীবনের এতবড় একটা ডিসিশান নিতে হবে একা একা । কারণ দোনোভান সোজা ওখানে হাজির হতে চাইছে আর মা চান ও বাবাকে জাস্ট জানিয়ে এখানেই বিয়েটা সেরে ফেলুক । কেবল সংবাদটুকু দেওয়া ভদ্রতার খাতিরে ! নাহলে লাঠালাঠি , জহর হবে ।

কিন্তু ওর মা যেমন এখন ওর অনেক কাছের মানুষ সেরকম বাবাও ওর কাছের । শৈশবে বাবাই ওকে বড় করেছেন । রাতের পর রাত মায়ের জন্য কেঁদে ঘুম থেকে জেগে উঠতো, দু:স্বপ্ন দেখে । দেখতো যে ও পরীক্ষায় ফেল করছে মা কাছে নেই বলে । সবার মা আছে । শুধু ওর নেই । আর তাই শুধু না ওর মায়ের নামে লোকে কুৎসা রটায় । মা কুলটা । চরিত্রহীনা ।

তখন বাবার বুকে মুখ রেখেই কেঁদেছে । তাই বাবার কোনো কষ্ট হলে ওরও বুক ফাটবে !

এদিকে জুয়াড়িদের দেখাদেখি দোনোভানও পশু পুজো করা ধরেছে । ওর প্রিয় গড একজন নেকড়ে ।

ও বলে :: নেকড়ু । নেকড়ু ঠাকুর/রাণ !

এখন নেকড়ের ছবি ও মূর্তি নিয়ে উপাসনা করা শিখছে কারণ নেকড়ে লড়াইয়ের দেবতা । কাজেই ওর বাবা যদি ফাইটে নামেন তাহলে নেকড়ে মানে নেকড়ু ওকে ব্যাক স্টেজ থেকে সদলবলে রক্ষা করবে ।

নেকড়ু দেবকে ও প্রতি মঙ্গলবার আহুতি দেয় । একটি করে মেষশাবক বলি দেয় । যতদিন না ব্যাপারটা মিটছে ততদিন এরকমই চলবে ।

একদল অসহায় জীব স্রেফ চামেলির কারণে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছে দেখে ওর ভারি খারাপ লাগছে ।

কিন্তু ও নিরুপায় । চারদিক থেকে বিভিন্ন ঘটনা ওকে জাপটে ধরছে । যা ওর কন্ট্রোলের বাইরে ।

অনেক ভেবে চিন্তে ও স্থির করলো যে বাবাকেই জানাবে সব খুলে । দেখা যাক্ বাবা কী বলেন ! উত্তর সবারই জানা তবুও । হয়ত ও ফিরে যাবে বুকে পাথর নিয়েই । মাকেও ত্যাগ করবে তখন ।

এইসব ভাবছে কদিন ধরে আর ভাবছে যে নেকড়ু দেব বসে বসে কচি ভ্যাড়া খাচ্ছে প্রতি মঙ্গলবার ।

অথচ এই সমস্যার সমাধান হিসেবে যে **চামেলি ফিরে যাবে ভেবেছে পাকাপাকিভাবে, তার বিন্দুমাত্র হদিস্ কি দিয়েছেন ভক্ত প্রহ্লাদ্ কে ? অর্থাৎ দোনোভান কে ?**

এক শুভ লগ্নে বাবাকে ফোন করলো । আগে **এস এম এস** করে অনেকটা সময় চেয়ে নিলো । পরে ফোনে সব খুলে বললো । একটা ঝট্কা যে লাগবে তা বুঝতে পেরেছিলো । যে কেউই পারবে ওদের বংশের ইতিহাস জানলে । কিন্তু অবাক করার মতন ব্যাপার হল এই যে ওর বাবা কিন্তু একবিন্দুও অবাক হলেন না !

বরং খুব হাসলেন । প্রাণখোলা , দিলখোলা হাসি ।

এরকম হাসতে সে কোনোদিন দেখেনি , ওর বাবাকে ।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠেন :: **আমি এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম । আমি শুধু দেখছিলাম যে তুমি আমাকে জানাও কিনা দোনোভানের কথা । নাকি নিজেই বিয়ে সেরে ফেলো । আজকালকার ছেলেপুলে তোমরা , তোমাদের বাবা-মায়েরা শুধু বিয়ের নেমতন্ন খেতে যান । পারলে ইন্সট্যান্ট নাতি/নাত্‌নিও বিয়ের আসরেই পেয়ে যান । কাজেই আমি অবাক হইনি । তুমি যেদিন বাড়ি ছেড়ে বিদেশে গেছো সেদিন থেকেই আমার চর তোমার পেছন পেছনে ঘুরছে সেটা তুমি জানতে ?**

তুমি আমার বাবা নাকি আমি তোমার বাবা ?

কিসে তোমার ভালো হবে তুমি বেশি বোঝো নাকি আমি বেশি বুঝি ? দাও , তোমার মাকে ফোনটা দাও তো দেখি ! চৈতালির আমার বিরুদ্ধে অনেক কমপ্লেন আছে তাই না ? অনেক নেগেটিভ ইমোশান্স জড়ো করেছে বুঝি ? দাও ওকে দাও দেখি !

ফোনটা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় চামেলি । লেরয় গোগোল ওকে, মানে এক বিষাক্ত চামেলি ফুলকে মায়ের প্রাণনাশের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ও মনে হয় চৈতালির প্রাণ ফিরিয়েই দিলো ।

এই প্রথম সবুজ, সতেজ ফুলের ঝাড়ের পাশে ও আর দোনোভান ফিজিক্যাল হয়েছে । ওকে চুমু খেয়েছে দোনোভান । আর দুজনেই এক সিপ্ করে রেড ওয়াইন ।

চামেলির বাবা, কেশর ব্যবসায়ী মানুষটি অন্তরে জাফরানের মতনই অভিজাত ও কোমল ।

কেবল বংশের নিয়ম মানবেন বলে জহর সমর্থন করে এসেছেন কারণ পিতামহ ও পিতার অবাধ্য হবেন না তাই । প্রাচীনকালেও তো কত রাজপরিবার জহর ব্রত নিতো । বিশেষ করে রাজ্য আক্রান্ত হলে । বিধবা রমণীগণ, পরপুরুষে যাবেন না বলেই ।কাজেই জহরকে ওর বাবা মন্দ ভাবেন না । একটু অন্যরকম আরকি ।

আর উনি বলেছেন যে ,তোমার মা জীবনে এত কষ্ট সহ্য করেও মানুষকে সৎ-পথে চালিত করার ব্রত পালন করছেন । একটি কমিউনিটির উপকারে নিজের পঙ্গু জীবন ঢেলে দিয়েছেন । কাপুরুষ সেই মানুষ যে তোমার মাকে ছেড়ে চলে গেছে ।

ধিক্কার জানাই সেই মানবরূপী কামুককে যে পরস্ত্রীকে বশ করে সম্ভোগের লোভে আর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তাকে ফেলে চলে যায় । এখন হয়ত

চৈতালি বুঝতে পারবে কেন আমি পসেসিভ ছিলাম । মানুষ চেনা সহজ নয় আর নির্ভর করার মতন পুরুষ মানুষ দুনিয়ায় সত্যি খুব কম আছে । কিন্তু চৈতালি আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই চলে গেলো । একবার যদি আমাকে বলতো তাহলে হয়ত আমি নিজেকে বদলে ফেলবার চেষ্টা করতাম ।

যা ভেবেছিলো চামেলি ঠিক তাই । ওরা কোনোদিন স্পষ্ট করে কথা বলেন নি । কোনো আলোচনা না করেই ভেঙে দিয়েছেন সম্পর্ক । কেউ কাউকে কোনো প্রশ্নও করেননি ।

উপসংহারে কোনো সংহার নেই । যদি থাকে তাহল ভুল বোঝাবুঝি , মৃত সম্পর্ক , অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজাল ভাঙা ইত্যাদি ।

নিশান্তে, দিনান্তে কিংবা অজান্তে মধুর সমাপ্তি হল ।

চামেলির বিয়ে হল ধূমধাম করে । দোনোভানই বর । বরবেশী দোনোভানের নিদ্‌বর হলেন স্বয়ং নেকড়ু দেব ! কারণ ওর বিশ্বাস এই অর্চনাই এনেছে মিলন ।

দোঁহে মিলবে বাঁশরির সুরে নয় নেকড়ে বাঘের হুঙ্কারে ! চৈতালি মানে মাকে দেশে নিয়ে গেছেন বাবা । এখন থেকে ওরা দেশেই থাকবেন । ওদের বাড়ি । অনেকেই বিরক্ত কিন্তু বাবাই ওদের বংশে শেষ কথা । বাবাই মালিক । কাজেই দোর্দন্দপ্রতাপ বাবার সামনে সবাই কেঁচো !

বাবা অবশ্য ফাঁকা মাঠে বাঁশি বাজান নি । বাবা যুক্তি দিয়ে ওদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এসব প্রথা হল একধরণের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস । মানুষের শুধু কেন প্রতিটি জীবেরই লক্ষ্য হল ইভোলিউশান । তা নাহলে আজ আমরা হয় বাঁদর কিংবা গোরিলা থেকে

যেতাম । যদিও আচার বিচারে ওরা আজও গোরিলাই আছেন কিন্তু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন যে জগতে সবাই যখন মানুষ থেকে অমৃতপুত্র হবার দিকে এগোচ্ছে তখন ওরা পেছনদিকে কেন যাবেন ?

কতগুলো যুক্তিহীন , বস্তাপচা নিয়মের কারণে ?

আর যেই যুবক অপরিচিত , অসহায়, পঙ্গু নারীকে মা সম্বোধন করে নিজগৃহে ঠাঁই দেয় ও নিয়মিত তার পরিচর্যা করে যায় সে কোন জাতের অথবা ধর্মের তাই নিয়ে একমাত্র উন্মাদরাই মাতামাতি করবে ।

মানুষের একটাই ধর্ম , মানব ধর্ম ; একটাই রেস -- হিউম্যান রেস । আর কি ?

চৈতালির কথা আর কী বলবেন নিজ মুখে ?

নিজের বৌয়ের গুণগান লোকসম্মুখে করবার মতন স্মার্ট উনি নন । এরকমই মনে করেন । কাজেই ছোট্ট করে সবাইকে বলেন ::: **সি ওয়াজ নট হ্যাপি হোয়ার সি ওয়াজ সিন্স ইট ওয়াজ মাই সন্ ইন লওজ হাউজ । অ্যান্ড লিগ্যালি আই অ্যাম স্টিল হার হাজব্যান্ড অ্যান্ড সি ইজ স্টিল মাই ওয়াইফ ।**

চাঁদের মধুর আলোতে যখন নববধূ- তার দোনোভানের কাঁধে মাথা রেখে কেশর ক্ষেতে ঘুরে বেরাচ্ছে , হাতে হাত রেখে, আনন্দে --তখন ওদের প্রাচীন মহলের চোরাকুঠুরিতে , মুখোমুখি দুই প্রৌঢ় !

ঘরটা একইরকম আছে কিনা দেখতে এসেছিলেন চৈতালি । এটা ওদের গোঁসা ঘর । বাড়ির মহিলারা গোঁসা করে এখানে দিন কাটাতো ।

হুইল চেয়ার ঘুরিয়ে সোপানের বদলে ঢালু পথে নেমে আসেন গোঁসা ঘরে । হ্যাঁ , ঠিক সেইরকমই আছে । বিরাট বেলজিয়ান গ্লাসের আয়না । মোটা গদি মাটিতে পাতা । অজস্র শুকনো ফুল দিয়ে সাজানো । ড্রাই ফ্লাওয়ার্স । তামার চোখ, নাকবিহীন মূর্তি । এগুলো সবই চৈতালির নিজ হাতে কেনা । আর পারশিয়ান কার্পেটটাও একই আছে । কিছুই বদলায় নি আজও ।

একই আছেন গুরুগম্ভীর, একটু বেশি সেক্স করতে চাওয়া , বাইরে ব্যাক্তিত্বপূর্ণ কিন্তু মধুরাতে লোভী পুরুষ হয়ে ওঠা ঠাকুর সাহেব যাকে চৈতালি, শান্ডিল্য বলেই সম্বোধন করতেন । সবার কাছে উনি ঠাকুর সাহেব কিন্তু চৈতালির শান্ডিল্য ।

রেশমের পোশাকে ঝলমল করছেন । এক অমল আলো ওর মুখে । বয়সের সাথে সাথে চেহারায় এক অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য এসেছে । তার দুর্বল দেহ দেখে সমস্ত কিছু ভুলে আজ নিয়ে এসেছেন নিজ গৃহে । আজ থেকে ওরা আবার স্বামী স্ত্রী ।

সেইভাবেই থাকবেন । ওদিকে ওনার কর্মকান্ড সামলাবে দোনোভান । পরে হয়ত যোগ দেবে মেয়ে চামেলিও । কিছুকাল চাকরি করার পরে ।

মেয়েটা খুব চাকরি করতে চায় । স্বনির্ভর হতে চায় ।

পরিত্যক্ত মেন্টাল অ্যাসাইলাম আজ আশ্রমে পরিণত হয়েছে । জুয়াড়ি ঢুকছে এক এক করে- আর বার হচ্ছে এক একজন ঋষিরাঙা হয়ে । মগজ সাফাই মেশিন যেন ওটা । পেটেন্ট নিয়েছেন চৈতালি নিজে !

শান্ডিল্যও তো কোনো ঋষিরই নাম তাই না ?

এমন কোনো ঋষি যার কোলে মাথা রাখবার অধিকার আছে একমাত্র চৈতালি নামক এক রমণীর যাকে সমাজ কুলটা বলে । ঋষির পবিত্র বাহুস্পর্শে কুলটা আজ

সতীত্বে ডুবে যাচ্ছে । জহরকুন্ডের পাশেই এক অদেখা হোমশিখার স্পর্শে ।

তার জীবনে আজ হঠাৎ রং লেগেছে । তাই শান্ডিল্য মুণির কাঠিন্য আর চামেলি ফুলের পরশ দুটে একই সুরে বাজছে যেন মায়ানদীর দুইকূলে ।

আর নদী হয়ে বয়ে চলেছেন, চৈতি ফুলে ঢাকা চৈতালি । অশেষ দাপটে ।

দুইপাড়ে আজ তার লৌহকপাট । পাড় ভাঙার মতন ঢেউ বা স্রোত নেই একটিও ।

লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া কে পুলিশ ধরেছে , অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার চার্জে । ওর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে ওর গার্লফ্রেন্ড স্বয়ং । কারণ আজ যে চৈতালিকে মারাতে চাইছে, কাল প্রয়োজন ফুরালে সে তাকেও মেরে ফেলতে উদ্যত হবে । নয় কি ?

ইতিহাসই তার সাক্ষী ।

কাজেই --লেরয় গোগোল ভার্সিগোড়া এখন মোটা মোটা শিকলের কব্জায় । সেখানে বসে বসে একলা পথে - মেয়েদের রহস্যময়ী ভাবতে অভ্যস্থ হচ্ছে !

আর শেষ অঙ্কে দোনোভান ও চামেলি ফুল, জগতের সমস্ত মেটাফোর নিজেরা করছে ।

দোনোভান ; ওর পাতানো মা চৈতালিকে দেশে ফিরতে দিতে চায়নি । অনেক চেষ্টা করে ওকে আটকাবার । শেষে না পেরে মজা করে বলে ওঠে :: তুমি থাকলে গাড়ির পার্কিং করতে সুবিধে হত । এখন এই এক্সট্রা **Disabled -পার্কিং** কোথায় পাবো ভীড় রাস্তায় ?

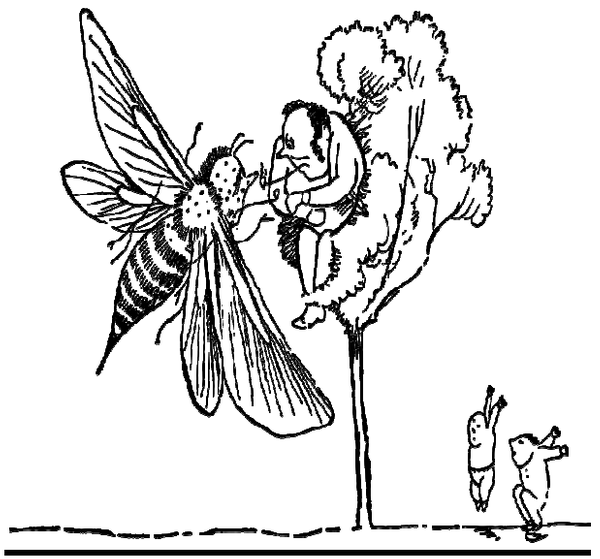

FUNGUS

Fungus

There was a woman named Mandavi Laxminarayan. She was a Tamilian by birth. Her father was a south Indian orthodox who used to visit a Hindu religious leader. The religious leader claimed he had attained Moksha.

Mr. Laxminarayan was a banker and very religious minded in all his works. He had two kids.

The Elder one, Rocket, was a businessman sold weird food. He used to sell monkey's brain, duck feet, chicken feet, pig's head, fried spider egg, snake wine and snake blood.

Since Chinese businessmen were invading India, he too had a Chinese partner who advised him on Chinese food and suggested marketing to Indian buyers. Many people actually loved it! The generation Y is very open minded and they wanted to taste various cuisines. So, the food factory was a hit!

On home front, his parents especially his father was not at all happy with him. He named him Rocket so that he can be a brilliant rocket scientist, instead he had dug a pit hole of notorious Chinese food and fell for it!

Rocket was a strong minded guy so he ignored his father's advice and irritation and started living separately with his girlfriend who was 8 years his senior and had a son from a previous marriage to a German man.

This was also a matter of conflict with his parents. He once told his father, “it is me who is marrying, not you!”

His father was a man of old values so he was comfortable with his own beliefs. Rocket shifted to a new home and started living with his partner and her child. He used to babysit and change the kid’s nappy. His partner praised him all along for this, but his family was unsure whether to continue their relation with him or to stop contacting fully!

It was his sister Mandavi who always encouraged him and cheered him up. She always supported him in all aspect of life. Though she was younger than him still Rocket used to call her his Mom.

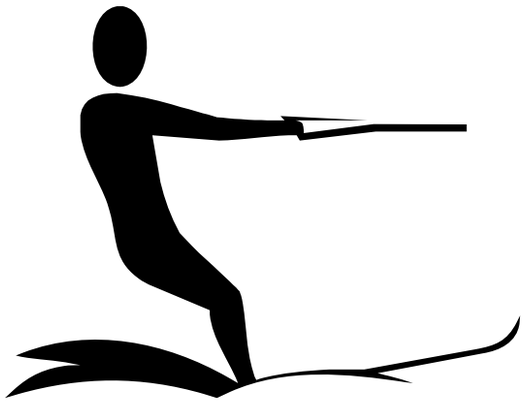

Mandavi had her share of problems. She was a student of astronomy and had fallen in love with one of her professors' who was a widower and quite senior to her. Above all this, the profie never used to have a shower and was very unclean.

Her friends used to laugh at her for her choice but she was madly in love with her profie Dr. Ivor Lang for his cerebral activities and brilliance .

Dr. Lang though was of Chinese origin still he used to speak fluent English not-**Chinglish (Chinese kind of English**). This is how many describe Chinese English! He was a

regular client of Rocket's weird food factory! He used to praise Rocket for his courage to introduce bizarre cuisine in the Indian terrain.

He further used to say ::**The whole commodity world is divided into two types—Chinese and non Chinese. Previously I used to think that only I am made in China but now I can see that most of the human beings are made in China with sharp features !**

The profie had a wife called Knatty. She had died in mysterious circumstances. Her body had no scar mark or blood leakage but somehow people felt that she died on the main road due to some kind of shock. Professor Lang was not in the country at that time. He returned heart broken

and sad. Ate a lot of fried spider egg and pig head and then went for a year long sleep! Yes! He used to sleep for a long time. Like Kumbhakarna!

People used to tease him by saying::
Hello Professor Kumbhakarna Ting Ting;

your door bell is Ring Ging!!

Mandavi used to visit him regularly at his place. He had a private observatory. He used to teach and show her various new stars, galaxies and milky ways. They have discovered a new planet and have named it DRAMILA.

She enjoyed the lesson as well as his company. One day he told her that he has found a way to travel to parallel universes. There are multiple universes existing, alongside ours.

Travelling to these magical places is called quantum jumping.

He asked her to keep it a secret. He said that people who die here are actually travelling to other universes according to their life energy's

vibrations. They attuned to those vibrations and live there for some time and again travelled somewhere else or return to our universe. He has seen his departed wife in such a universe. He claimed to know many people on earth plane, whom he met in other universes before they were physically here.

All these statements kept Mandavi spellbound.

Mandavi was a pretty young lass who had more interest in the object than the subject. But the profie was a failed lover. Neither he spoke of love nor he asked her why she was so keen to take private lessons. Whenever they met he always lectured on deep theories about black holes, dark matters and cosmology.

Nobody knew the deep emotions of his mind which was always into solving nature's mystery and cosmic problems as if human problems does not exist at all!!

One day the professor invited her for lunch at his home. He himself has cooked duck biriyani for her.

Mandavi was a vegetarian but for her love's sake she ate non vegetarian food for the first time. Though her brother Rocket used to run a non vegetarian weird food factory but her whole family was vegetarian. Rocket used to eat chicken and egg but was not into pork and spider egg.

After the meal, the professor gave her a dessert called ling-fing-chon.

Ling-fing-chon was originally prepared from mushroom which can absorb huge amount of vital energy needed to travel to a parallel universe.

Unknowingly, Mandavi consumed a good amount of the dessert. The taste was not very pleasant and had a typical bouncy effect like other mushrooms! But the euphoria which she experienced was enormous!

After eating the food she fell asleep. In deep sleep she went to a parallel universe. It felt like dream but the professor was there, her departed friends and others were also there in blood and flesh.

There was a calm and peace all over.

No one was in hurry. A huge screen was on the side of a lawn. It was a kind of life review. Your desires that you had in that universe manifested for you in the dream!

There was a huge hand like structure which the beings there were calling Quantum Hand.

The hand was pulling and placing all the beings into their respective universes.

She saw her old grandmother who has now become quite young and lovely was dating one of her departed, handsome classmates. In another universe she saw her granny sitting and cooking authentic Arabic dishes for her orthodox current father !

Everyone existed after death. We call it death but in real sense it is travelling to another dimension.

The journey stops here and they take another vehicle and continue to live in

another world where they are much more alive and passionate.

The same person or animal can live in multiple other worlds simultaneously.

One is a carpenter in one world, a thief in another, and a sage in the third.

All these universes have separate vibrations. They are attached to a source which has no vibrations at all and is the source of life, peace and all motivations.

It is a prism kind of a thing which is emanating beautiful living light. It was absorbing certain beings who were going towards it and then other

new images were coming to life from it!

Spectacular events were taking place!

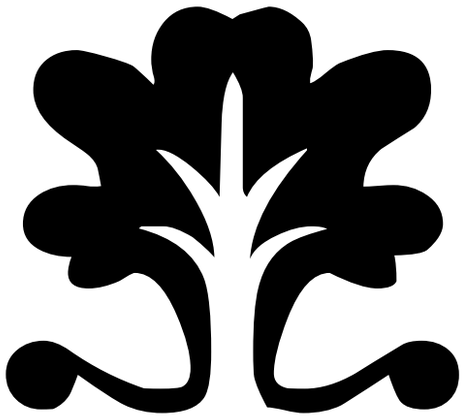

Mandavi was mesmerized. She asked Professor Lang about the phenomenon. He said that it was the way the universe worked. Actually, they were numerous in count and huge in size. The consciousness continues to exist elsewhere according to the being`s choice and priorities.

“We all are connected and same. It is the vibration which keeps us as separate entities”, he said.

After saying all these he offered her to have sex with him in a parallel universe where the rules were not so stringent like this earth plane.

Since he was previously married and she was not it was almost impossible for them to have sex morally in India. But in that parallel universe the rules were not so rigid. They put a lot of effort on the happiness of mind instead of blind rules.

In that specific universe no one got pregnant either!

They could even materialize the thought instantly!

Mandavi had sex with Professor Lang for one thousand years!!!

When they came back on earth it was only a few seconds then!

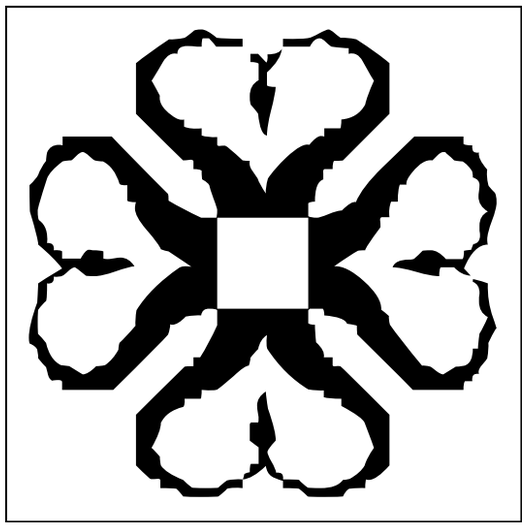

The most interesting thing was that Prof. Lang could change any disaster or calamities here on earth by moving the incident on other universes.

When the incident was about to happen on earth there was still time when it would actually take place in other universes!

So, if anyone shuffled the events then and there in that universe then it could not travel to the earth plane and hence the accidents, calamities did not happen.

In this simple way the profie had prevented several disasters, earthquakes and terrorist attacks by shifting his consciousness with the help of quantum hand to the other

universes and acting on the event at that time.

Slowly it had become a matter of practice for Mandavi and Lang to change the things that were going to happen here in the earth plane!

Sometimes it was catastrophes, sometimes it was playful dramas and sometimes political scenarios.

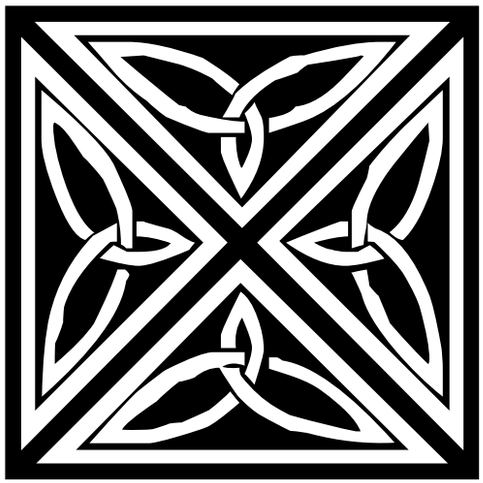

Then one fine morning Mandavi came to know that Professor Ivor Lang had been locked into a parallel universe from where there is no coming back to this world or reality!

He had lost the quantum hand which was his tool and man Friday for travelling to other worlds and quantum leaping!

She was surprised. Astronomer Lang was a perfectionist and alert being. So how come his tool was lost and locked in some other place?

But there were no other being who could answer her questions! She felt pity for the professor.

Nowadays they were not into sexual and sensual pleasure anymore but they used to travel to lovely worlds where beings were more into infatuation.

They had sex only about ten times in parallel worlds but each time from thousand to million years. So perhaps their bodily urge had subsided. Their desire is now like a burnt seed.

The seed had sprung to tree definitely but in other planes and in other fashion. So now though the seedling contained all the properties of the tree but now in a burnt state .

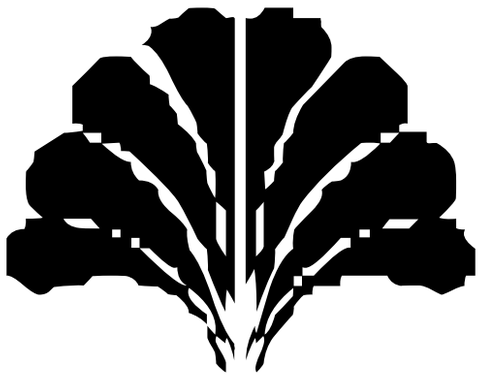

But her beloved was locked into another universe with his tool!

How will she plan for his escape?

How will he get freedom?

These were her nightmares now!

Slowly she moved to her brother's place and had a quick chat with him about all the happenings and quantum hand.

Her brother was pleased to know that professor Lang was her boyfriend and they had intimate relation in parallel world. He told her that she is still her sister and he loves her with all her virtues and vices! He did not have any intention to correct her.

Then he surprisingly told her that Lang had once said to him that he knows about a magic hand which could travel in time and reach to other dimensions but he is not sure how long it can work independently because human beings are offering money to the hand for travelling to other worlds and correcting their morally incorrect deeds.

Till then the magical hand has sustained all the pressure but he is not sure how long it could continue to resist!

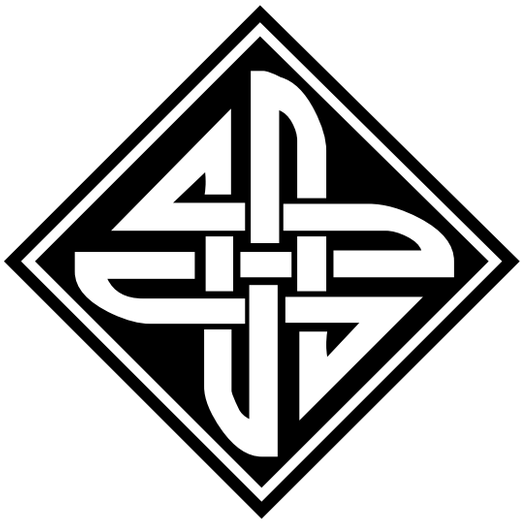

That very night a very bright light came to Mandavi's room.

It engulfed the whole room. It was soothing, golden and spiral.

The light took the shape of Professor Ivor Lang, her beloved boyfriend.

Kissed her on her forehead and said –

ET's are real but UFO's are unreal.

He had traversed multiple worlds and came to the conclusion that the earth plane was the worst. Here everything was dependent on money and selfish motives. That's why he has continued his living in another universe where there is peace and tranquility.

He would never come back here permanently. When he returns he is in a light body. A blanket of love and light was covering him.

The mechanical quantum hand has lost it's vitality and effectiveness due to earthly fungus which had spread to it's core slowly. It had started as he became popular and got offering of large sum of money from corrupted people in this earth plane.

Mandavi was pleased to get back her boyfriend and prince charming but did not know how to follow him now in the other side without the magical hand!

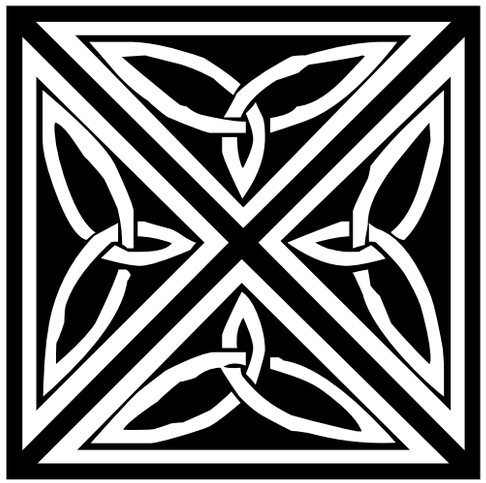

Knowing this, Professor Ivor Lang burst into laughter and said ::

“I will show you the real Mandavi and the real Lang. I am inside you and you are in the core of my being! I have learnt to decode my life energy and disintegrate into zero vibration and have found that we both are the same and are living light beams.

It was our intense physical limitations which made us believe that we are separate. Now as you know we both are the same there is no need to travel elsewhere. We can touch each other inside our own heart and engulf love forever. Love, heaven and magic all is here! So dive deep into the core of your being and find me there!!

Last but not least, this is your spiritual enlightenment or nirvana/moksha in a

scientific way and with the help of realistic quantum technique instead of slow, mysterious meditation…Science means logic, proof and speed while discovering reality.

Enquire who you really are and find me everywhere in all dimensions."

Mandavi just laughed out loud because her father was on the same path but with a touch of rigidity and boring superstitions. In the journey of love and peace he started dividing all the beings into pieces and ended up in a path full of hatred and negative vibrations.

You need to be real enough to be believable, but you don't necessarily have to be real enough to be real. There is a distinction.

Bradley Whitford

The end

Lastly I want to thank my publisher for giving me a chance to publish my books and my readers , for their constant support and

encouragement .

They are the actual bits and bytes of real Gargi Bhattacharya, the author !!!

সমাপ্তি

Proof

Printed By Createspace

Digital Proofer